প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৭
জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক
অবনীরঞ্জন রায়
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
এন. সি. শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ তারক চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৫

জন্ম

মেঘে মেঘে রক্ত ঝরে, রক্ত ঝরে আকাশ মাটিতে
হাওয়ায় ; হাওয়ার মতো হৃদয়ের ভাবনাগুলিতে
রক্ত ঝরে ; নীল মেঘ, কালো মেঘ, সাদা বলাকার
মতো সারি সারি মেঘ রক্তে রঙে হয় একাকার
ঋতুর দাহনে ; পোড়ে মেঘের অরণ্য, মেঘগ্রাম ;
মনের সহস্র গলি রক্তস্নাত জানায় প্রণাম
ক্রান্তিলগ্ন আবির্ভাবে। অদৃশ্য গ্রহের হাতে লাগে
রক্তটিপ ; রাত্রি-ছেঁড়া নবজাত শিশুর ললাটে
শনি করে মন্ত্রস্পর্শ; মঙ্গল আগ্নেয় তুলি নিয়ে
আঁকে লালবর্ণ ছবি। জন্মময় অসহ্য যন্ত্রণা
ভুলে তা জননী ছাখে থরোথরো! মায়ের বেদনা

দেখে বিধাতাও একবার তার আদেশ ফেরাতে
ফিরে আসে ; স্তব্ধ হয় ; শিশুর দু'চোখে ঝরে সোনা

যতীন দাসের ফটো

কুৎসিত বাঁকানো মুখে জীবনের অদ্ভুত উৎসব
অফুরন্ত আলোকের উদ্ভাসিত ঐশ্বর্যে, প্লাবনে ;
ধীরে ধীরে সেই মুখ হয়ে এলো আশ্চর্য সুন্দর
অবিশ্রাম তারা-ঝরা জীবনের বর্ষণে ও গানে।

অনেক দেখেছি ছবি, দেখিনি উন্মত্ত দ্বিপ্রহর
পদ্মার কি মেঘনার নীলকণ্ঠ স্বর্ণায়ু জটায়,
সাপ-খেলানোর নেশা মৃত্যু দিয়ে কেনে বাজিকর
দেখিনি এমন ছবি মথুরায় কিম্বা অযোধ্যায়
কোনদিন! আজ দেখি রঙচটা তথাপি বিচিত্র,
অসুন্দর, তবু মুখ সূর্যের কি সমুদ্রের মিত্র।

এই ছবি দেখে দেখে স্পষ্ট হ'লো কেন মরা হাড়ে
দধীচি এখনো বজ্র? সব গ্রহ আগুন তো নয়
একথা যেমন সত্য, তবু কেউ পুড়ে যেতে চায়
পৃথিবীকে আলো দিয়ে, কী আশ্চর্য, সে-ই সূর্য হয়!

দোল ও পূর্ণিমা

সর্বত্রই এক মুখ : রঙে রঙে একাকার কিশোর মিছিল ;
যেন এক ঝাঁক চিল
দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হয়ে দিঘির ভেতরে
সূর্যের বলের মতো রঙের চেতনা নিয়ে ক্লান্ত খেলা করে।

সর্বত্রই এক ক্লান্তি, শোলোক ফুরুলে
চুলের আবীর নিয়ে ঘুমায় স্বপ্নের শিশু ঠাকুমার কোলে।
আকাঙ্ক্ষায় পুড়ে যায় রূপকথার নক্ষত্রের অদৃশ্য কপাল...
একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল।

স্বদেশ

ভোর হল—

গানে নয়; হাওয়ার জ্বরে, শিশিরের ফিসফিসানিতে কোনো গান নেই; কোনো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অসহ্য পুলকে আলোকের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সূর্যমুখীর জন্ম-লাভের চেতনাঝংকার এখানে নেই ···শুনি বিছানায় শুয়ে রাতশেষের কুকুরের কান্না, কাকের চিৎকার; বহুদূরের কোনো মালগাড়ির একঘেঁয়ে গোঙানি। ট্রেনের চাকার নিচে পিষে যাচ্ছে মাটি; যন্ত্রণায় ধরিত্রী কেঁপে উঠছে—

সূর্যদেব, তোমার ঘুম কি ভাঙল?

পোড়ো জমি খাল নদী পথ। শীতে মৃত শিশির ঝরে পড়ছে সূর্যমুখীর ডালে ডালে; ফুল তবু ফোটে না! যেখানে হেমন্ত-রাত্রিশেষের ক্লান্ত পদধ্বনি শুনে শুনে শেফালি বালিকারা মৃত্যুবরণ করেছে, সে মাটি এখন বন্ধ্যা! ইতিহাসের কী নির্বোধ পরিহাস!

কথা বলো, সূর্যদেব! কথা বলো! এই শীত, এই চিররুগ্ন বৃদ্ধের উত্তাপহীন কর্কশ বিলাপ আমাদের ক্লান্ত করে···ক্লান্ত···

কিন্তু কেন এই পোড়ো জমি মরা নদী গ্রাম হাওয়া আর হৃদয়? যেন ভোরবেলা এসে দাঁড়িয়েছি শতাব্দীর নিঃশব্দ কবরখানার পাশে; যেন প্রেতাত্মার রুদ্ধ নিঃশ্বাস কোন্ ধূসর মৃত্যুর প্রান্তরে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে আশাহীন অসহায় রাত্রির রক্তাক্ত শিকারের মতো! তবে কি, এইমাত্র রেললাইনে দাগ কেটে কেটে যন্ত্রণার যে-মালগাড়ি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গেল, তার কোটরে কোটরে বৃদ্ধ মরা নিরুৎসাহ সভ্যতার লাশগুলি পাশাপাশি শুয়ে আছে যুদ্ধশেষের সাজান ক্লান্তির স্থাবর পাহারায়?

আমরা তো আজ মুক্ত, হে আলোর ঈশ্বর! স্বাধীন দেশ প্রান্তর মাঠ অশ্বত্থ চারাগাছ বন্দর! তবু কী বীভৎস এই আভিধানিক সম্ভাষণ—ধর্মপুত্রের কম্প্রকণ্ঠোচ্চারিত ভ্রষ্ট অশ্বত্থামার আদিম মৃত্যুসংবাদ! তুমি তো জানো সূর্যদেব, বন্দী জনসমুদ্র ফুঁসে ফেঁপে উঠেছে শৃঙ্খল-যন্ত্রণায়! স্বাধীন ঋতুর প্রান্তরে একটি চারাগাছও আজ পল্লবিত নেই!

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বেকার জীবনের পাঁচালি

কিবা আসে যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে
শরতের রোদ মুছে নিয়ে যায় মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে
হেমন্তে যদি বাতাস ফোঁপায় কিংবা পঙ্গপাল আসে
অসময়ে গাঁয়ে খামারে গঞ্জে বস্তিতে বাঁকা শীত হাসে
তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, মিতে!
এসো, তালি-দেওয়া জুতোজোড়ায় সযত্নে বাঁধি ফিতে!

কিবা আসে যায় বন্দর যদি শ্মশানের ছাই গায়ে মাখে
ঘরে ঘরে মরা শিশুর কান্না ক্ষুধিত মায়েরা মনে রাখে
কাব্যের ফাঁকে 'নেই নেই' ঢোকে, জাত-কবিদের ভাত মারে
কিংবা শিল্পী স্বপ্ন বানায় হাজার শিশুর মরা হাড়ে
আমাদের দিন বদলায় নাকো, মিতে!
হাঁ-করা জুতোটা অবাধ্য বড়ো, ভালো করে বাঁধো ফিতে!

কিবা আসে যায় চাঁদ যদি ফেরে লজ্জায় ঘরে উঁকি দিয়ে
কড়িকাঠে ঝোলে বিবসনা নারী হবু-কবিদের ফাঁকি দিয়ে
কিংবা সাগর ফুলে ফেঁপে ওঠে, গর্জায় আর চোখ রাঙায়
উজিরের ঘুম ভাঙে অসময়ে, কোটাল সভয়ে বিদেশ যায়
আমাদের চলা এতেই কি শেষ হয়?
দাঁতালো পেরেক, তালি-খাওয়া জুতো অনেক কথাই কয়!

লাল শপথের রাখি

শহরে এখন সন্ধ্যা নেমেছে, তৃষিতের কথকতা...
ফ্যান দাও বলে কারা কাঁদে রাস্তায়
ঘরে নেই ভাত, মাগো, তুই কাছে আয়—
আমি পড়ি বসে কুপির আলোয় জীবনের রূপকথা।

আমি পড়ি বসে শীতের তুষারে নভেম্বরের গান :
দশ দিন যেন দশটি ঝড়ের ছেলে
মরণকে দেখে হেসে দিল বাহু মেলে—
রূপকথা নয়, ইতিহাস মাগো, ক্ষুধিতের অভিযান ।

চোখে কেন জল, চোখ মুছে দ্যাখ্‌, দুদিনের উপবাসী
ছেলে তোর আজ একটু কাতর নয়—
বুক বাঁধ তুই, আমাদেরই হবে জয়
শীতের তুষারে কান পেতে শোন্‌ ঝোড়ো বাতাসের হাসি

শহরে গভীর রাত্রি ঘনায়, তুই আমি বসে থাকি ;
আমি পড়ি বসে পৃথিবীর উপকথা
তুই দুয়োরাণী, ভোল্‌ রাত্রির ব্যথা—
কাল ভোরে হাতে পরিয়ে দিস্‌ মা, লাল শপথের রাখি !

মিছিলে

বোকা ছেলেটার হল এ কী
পেটে নেই ভাত, পাগল তাই ?
মিছিলে মেসার নেশায় কী
মরণেরও ভয় ছেঁড়ে সে কী !
বোকা ছেলেটার হল এ কী ?
লাঠি, গুলি, গ্যাস, যায় বৃথাই ;
এগিয়ে চলেছে : অন্ন চাই !

বোকা মেয়েটার হল এ কী
রুটি নেই, তাই ক্লান্তি নেই ?
সামনে ধুলোয় ঘুমিয়ে কে,
হোলি খেলে বুঝি শুয়েছে সে !
বুকের মধ্যে নিল ওকেই ;
আবীর মাখল ধুলো মুখেই !

রুটি দাও

হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশান রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র : রুটি দাও, রুটি দাও !
বদলে বন্ধু, যা ইচ্ছে নিয়ে যাও !
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা।

শুধু দুইবেলা দু-টুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি তবে সূর্যেরও আগে উঠি।
ঝোড়ো সাগরের ঝুঁটি ধরে দিই নাড়া
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া।
হৃদয়, বিষাদ, চেতনা তুচ্ছ গণি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি।

তোমার স্বপ্নের মঠ

(কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসেব জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

সতত তোমার আর্তি আমার রাত্রির ঘুম থেকে
তৃপ্তির আলস্য নিয়ে খেলা করে ; নিশির যন্ত্রণা
একতারার মতো বাজে ; শ্রান্তিহীন রক্তের অসুখে
বিবর্ণ সান্নিধ্য আনে অস্বস্তির আমৃত্যু সান্ত্বনা।

সতত তোমার ক্লান্তি আমার নির্বোধ হাহাকারে
মল্লারের সুর বাঁধে, কালের গলিতে তমসায়
ফণিমনসার ঝোপে, সূর্যোদয় রক্তাক্ত গহ্বরে
সর্বাঙ্গে প্রহারক্ষত দ্বিপ্রহর সঙ্গীত ছড়ায়।

সতত তোমার মৌন আমার জীবনে সূর্যমুখী
মৈত্রীর আশ্বাসে ফোটা একটিই আরক্ত কুসুম
দীর্ঘশ্বাসে ছিঁড়ে নেয়; নিষ্ফলের সন্ধ্যায় একাকী
নিঃসঙ্গ গায়ত্রীমন্ত্রে পুড়ে যাই; নিবস্ত নিঝুম
রোগশয্যায় তবু জ্বলি : ধু ধু মাঠ, অবাক জোনাকি;
প্রলাপের নটী নাচে মৃত্যুত্তীর্ণ ললাটে কুঙ্কুম।

পলাতক মনের প্রতি

সূচীভেদ্য অন্ধকার! একা এই অজ্ঞাতবাসের
শাস্তি : জানিনে কী আছে ডানে, বাঁয়ে, সামনে কী?
বন্দর, খামার কিংবা অরণ্য কি আগ্নেয়গিরির
কোন্ সভা?…আলো দাও, সাড়া দাও! ডাকি

প্রাণপণ! ডাকি—কোন সাড়া নেই। কোন আলো নেই
এ মহানিশায়! সামনে কে? কেউ নেই, শুধু সাপ,
সেও পলাতক! শুধু হাওয়া, সেও ভয়ে ভয়ে যায়
এই রাজ্য ছেড়ে! কিংবা একি রাজ্য? নির্বোধ! প্রলাপ

তবে বুঝি? তবে বুঝি জ্বর? কিন্তু হিম দেহ…স্থির;
এ কি মৃত্যু? তবে মৃত্যু এই!…শূন্য মস্তিষ্কের দাহ
মৃত্যুও না মোছে যদি। যদি নাম, স্মৃতিদের ভিড়
জনশূন্য এ শ্মশানে অশরীরী আনে বার্তাবহ
'রুটি দাও, রুটি দাও, রুটি দাও'—আকণ্ঠ চিৎকারে,
তবে ফিরে চলো মন দুর্ভিক্ষের মিছিলে, বন্দরে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি

সে এক অদ্ভুত রাত্রি ! থমথমে রক্তমাখা মুখগুলি জ্বরে
অকথ্য প্রলাপ বকে, দীপ-নেভা অন্ধকার বিছানায়, ঝড়ে
বুকগুলি তোলপাড় । জানালায় জল্লাদের হাতের মতন
কালো হাওয়া নড়ে চড়ে, হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে । নেকড়ের গর্জন
নগরেও শোনা যায় ; কুয়াশায় ঝাঁপ দেয় সারিবদ্ধ বাঘ—
সে এক অদ্ভুত রাত্রি ; ক্লান্তির শিয়রে ক্রান্তি লেখে পূর্বরাগ !

সেই রাত্রে ফিস্ ফিস্ রুগী আর নার্সের অস্ফুট গলায়
ভয়, শুধু ভয় কাঁপে, তারপর ধীরে ধীরে কেটে যায় ভয়—
কে যেন নির্ভীক হাসে । ভীষণ কঠিন হাসি প্রত্যেক দরজায়
বিবর্ণ রাত্রির চোখে চোখ রাখে, কথা বলে, ছড়ায় বিস্ময় ।
অন্ধকারে সেই হাসি আলো যেন, জ্বেলে দিল সমস্ত বন্দর ;
ঘরে ঘরে যুবতীরা খিল খোলে, যুবকের ছেড়ে যায় জ্বর ।

ধীরে রাত্রি স'রে যায় । শুদ্ধ ভোরে স্নান সেরে বাইরে এলাম···
ফাঁসির মঞ্চে কাল হেসে গেছ, গেয়ে গেছ, তুমি ক্ষুদিরাম !

নতুন চীন

(আধুনিক রূপকথা)

শিশু জন্ম নিল···

জন্ম নিল ঘুঁটে-কুড়ুনীর ঘরে
স্যাঁতসেঁতে মাটির বিছানায়
অযত্নে, ধুলো আর হাহাকারের মধ্যে ।

এ তো নয় আবির্ভাব, নয় কোনো প্রভাত-সূর্যের গান
সূর্যের আলো ঢুকতেই পায় না রক্ত আর কাদায় মাখা জননীর আঁতুড় ঘরে
শিশু ক্ষুধায় যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে,
কারো বুকে নেই একফোঁটা দুধ, কে মেটাবে তার ক্ষুধা ?

তবু জন্ম নিল
শিশুই জন্ম নিল আবর্জনার মধ্যে, এঁদো গলিতে, নোংরা লোকেদের পাড়ায়।
যাদের ঘরে নেই ভাত, পরনে নেই কাপড়
তাদের মধ্যে, তাদের উপোসের খুদকুঁড়োয় ভাগ বসিয়ে
দুয়োরাণীর ছেলের শৈশব কাটল।
তারপর···একদিন
মার খেয়ে খেয়ে যাদের কোমর গেছে ভেঙে, তাদেরই
কোলে চড়ে শিশু সূর্য দেখল
রক্তাক্ত, ভীষণ ক্রান্তিলগ্নের সূর্য !

ধীরে ধীরে শিশু বড় হল, দুয়োরাণীর ছেলে মানুষ হল,
অথবা মানুষ নয় সে, মানুষেরই মতো দেখতে, কিন্তু···
যে ভাষায় পড়শীদের ছেলেরা তোতাপাখির ছড়া কাটে
সে ভাষায় এ ছেলে কথা বলে না, বোঝেও না।
যে পথে মানুষের ছেলেরা সার বেঁধে ইস্কুলে যায়
দুয়োরাণীর ছেলে সে পথ মাড়ায় না, হয়তো চেনেও না।
সবাই বলে : 'এ কী অমঙ্গল ! ওকে দূর করে দাও,
নইলে বিপদ ঘটবে !'
সবাই বলে, শুধু জননী শোনে। তার মনে পড়ে রক্ত আর
কাদায় মাখামাখি একটি স্মৃতি—
এত রক্ত, এত যন্ত্রণা কি ব্যর্থ যাবে !···বুকে চেপে শিশুকে সে আগলে রাখে।
পড়শীদের করুণা হয় ; উচ্ছিষ্টের ভাগ দিয়ে তারাই তো
এ শিশুকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

তারপর
শিশু যুবক হল, কিন্তু এ কি ভীষণ চেহারা তার !
কপালের শিরা-উপশিরাগুলি যেন ছিঁড়ে, ফেটে বেরুতে চায়—
চোখের দিকে তাকানোই যায় না, এত আগুন, সেখানে এত তাপ—
হাত-পা'গুলি কাঠি কাঠি, কিন্তু বুকটা ভীষণ চওড়া ; এত চওড়া
যে অস্বাভাবিক ঠেকে।

কেউ কেউ বলে : 'এখনো তাড়াও, এখনো সময় আছে।'
দুয়োরাণী ভাবে, হয়তো এই আবির্ভাব…হয়তো… ?

এরপর শুরু হল রূপকথা। এঁদো গলিতে, নোংরা লোকেদের পাড়ায়
তবু শুরু হল ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প।
যাদের ঘরে নেই ভাত, পরনে নেই কাপড় ;
যাদের নতুন বউ রাঙা বউ হাহাকারে যন্ত্রণায়
ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদে, তারপর গলায় দড়ি দেয়—
সেখানেও শুরু হল অপরূপ সেই উপন্যাস, বিস্ময়কর, কিন্তু সত্য !
জন্ম থেকে বহুদিন যে ছেলে সূর্য দেখে নি, সূর্য জ্বলল তারই চোখে ;
সমস্ত বন্দরটা জ্বালিয়ে দিল।

অবাক বিস্ময়ে পাড়ার লোকেরা দেখল
সুয়োরাণীর লক্ষ পাইক, কোটি বরকন্দাজ সে-দৃশ্যের সামনে
পাথরের মতো সারে সারে দাঁড়িয়ে আছে—
তাদের চোখে পলক নেই, শরীরে স্পন্দন নেই।
সতীন-পুত্রেরা রাগে হতাশায় শুধুই চিৎকার করছে :
'মেরে ফেলো এ সাক্ষাৎ অমঙ্গলকে, জীবন্ত গেঁথে ফেলো !'
কিন্তু কে তুলবে হাত দুয়োরাণীর ছেলের গায়ে,
কে গেঁথে ফেলতে পারে জীয়ন্ত সূর্যের প্রচণ্ড অগ্নিশিখাকে ?

যারা এক-পা এগিয়েছিল, আগুনের চাবুক খেয়ে
দু-পা পিছিয়ে এল তারা।
পড়শীরা জয়ধ্বনি করে উঠল : 'আমরা বাঁচিয়েছি
তোমাকে, আজ তোমারই আশ্রয়ে আমরা বাঁচব !
তুমি সামনে থাকলে ভয় করিনে কোনো অত্যাচারকেই,
কারণ অত্যাচার তোমাকে ভয় করে।'
দুয়োরাণীর বুকে ঝড়, মুখে আলো, চোখে শান্তি—
মেঘ নেই, মেঘ কেটে গেছে।

একটি বিশেষ দিনের প্রার্থনা

সে মেঘ কোথা পাই
যে মেঘে কান্নার
অসুখ নেই, ক্ষীণ
ছায়ার মতো মা'র
কোলেই শিশু আর
কাঁপে না। ভাত দাও :
উপোসী ভাঙ্গা স্বরে
যে মেঘ ঘরে ঘরে
শোনে না হাহাকার ;
সে মেঘ কোথা আছে
যে মেঘে আলো নাচে ?

সে মেঘ কোথা থাকে
শিয়রে রোগা মা-কে
দ্যাখে না অসহায়
শিশুর চোখে চাওয়া ;
জানে না পথে পাওয়া
রোগের চেয়ে ভয়
জোয়ান স্বামী আনে,
রুটি না পথ্য না
কেবল কালো হাওয়া।
সে মেঘ কোথা পাই
যে মেঘে ব্যথা নাই ?

তুমি কি আছ মেঘ হাসির নীল মেঘ গানের আলো মেঘ,
কোথায় কোন্ দেশে
নিরুদ্দেশ তুমি, তাহলে! কান্নার রোগের কথা শুধু শ্রাবণে ভাদ্রেও
অসহনীয় লাগে। এ কোন অভিশাপ! এখানে এই ঘরে ব্যথার আঙিনায়।

এ কোন্ : দাও দাও, এ কোন্ : নেই নেই -হাওয়ার চিৎকার
মাটির হাহাকার ?

আলোর মেঘ এসো ! ঘুচাও বেদনার রাত্রি মুছে নাও ভোরের কুয়াশার
সকল যন্ত্রণা। একটু বসো তুমি ; হৃদয় হোক সোনা এমন আকালেও।

[সংশোধিত]

বেহুলা

সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
ব'সে আছি রক্ত পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে। আমি কান্নার যন্ত্রণা
গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়াই। যাত্রী

যারা ভিড় করে, হায়না, শকুন, শেয়াল—
কেউ বন্ধু নয়। লুব্ধ শিকারীর থাবা
ধারালো দাঁতের কশা দ্বিপ্রহরকেও
ছিঁড়ে ফেলে। তবু আমি বাংলার বিধবা

সতী, তাকে ফিরে পাব, হয়েছি সাবিত্রী !
পাতালে নরকে কিংবা যমের দুয়ারে
যেখানে ভিড়বে ভেলা, যাব। সমুদ্রেও
শান্ত প্রতীক্ষায় স্তোত্র গাঁথব পয়ারে ;

গান দেব, জ্বলব, কিন্তু হব না অঙ্গার ;
সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার !

বর্ষা

কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে
কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এল।
সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় হুগলি-গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধ'রে বেহুঁশ পড়ে আছে।

আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া—
শীর্ণ হাতে শিশুরা খোলে খিল।

নচিকেতা

কেন ফিরে আস বারবার?
স্মৃতির তুষার থেকে কেঁদে এসে শীতের তুষার
কেন হেঁটে পার হতে চাও?
এমন নির্জন রাতে যেই ভয়ে নক্ষত্র উধাও
অনন্ত আকাশ থেকে, সে নির্মম মেঘের কুয়াশা
কোন সুখে বুকে টান? এ নরকে কিসের প্রত্যাশা?

তুমি কি জান না; যারা আসে
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে সূর্যহীন এ সৌর আকাশে
চারদিকের মৃত গ্রহদের
কবর, প্রস্তর ভেঙে আসে; তারা নিজেরই রক্তের
পিপাসায় জ্বলে! কোনোখানে নেই এক ফোঁটা জল;
দীর্ঘশ্বাসে দ্বিখণ্ডিত এ মাটির অশ্রুই সম্বল।

কেন তবে সব ভুলে যাও?
এ প্রেতপুরীর বুকে মুখ রেখে কোন্ সুখ পাও?
আসমুদ্রহিমাচল এই মহাশূন্যের কান্নায়
কেবল পশুর নখ দাগ কাটে; বিষাক্ত হাওয়ায়

সাপের খোলসগুলি ভাসে শুধু ; আর
দিন-রাত্রির বুকফাটা 'নেই নেই নেই'-এর চিৎকার।

সে চিৎকারে স্বর্গ-মর্ত্য টলে
পাথরও চৌচির হতো ভারতবর্ষের বন্ধ্যা পাথর না হ'লে।
জঠরের অসহ্য ক্ষুধায়
ধূমাবতী জন্মভূমি সন্তানের দুর্ভিক্ষের ভাত কেড়ে খায় ;
এ কী চিত্র ! নরকের সীমা
চোখ অন্ধ করে দেয়, মুছে নেয় চেতনার সমস্ত নীলিমা।

তাই নিয়ে নচিকেতা, তবু তুমি গড়বে প্রতিমা ?
অন্ধ হবে, বোবা ও বধির
তবু ক্লান্তিহীন, মৃত্তিকায় পুনর্জন্মের অস্থির
জিজ্ঞাসায় মৃত্যুর তুষার
বারবার হেঁটে হবে পার ?
অগ্নিদগ্ধ দুই হাতে কতবার খুলবে তুমি যমের দুয়ার ?

৭ নভেম্বর

এক

একবার, শুধু একবার তুমি জ্ব'লে উঠেছিলে
হৃদয় আমার, ক্রান্তিবলয়ে তিমিরান্তক ;
দু'হাতে সরিয়ে আঁধারের যবনিকা
হেসে উঠেছিলে ভোরের দারুণ দীপ্ত তেজে,
অগ্নিশিখা।

একবার, তবু একবার সেই চির-প্রোজ্জ্বল আলোর দেশে
চেতনা আমার পেয়েছিল আশ্রয়
হৃদয়, তুমিই দিয়েছিলে বরাভয় ;
শীতের তুষার গ'লে হ'ল হ্রদ ভীষণ বিস্ফোরণে,

হলুদ পাতার পাণ্ডুর মুখে বসন্ত খেল চুমু
একবার, সে তো একবার।

একবার, তবু একবার আমি মানুষের ছেলে
মানুষেরই মতো হেসেছি, বেঁচেছি, মানুষের মতো
গান গেয়ে গেছি নভেম্বরের দারুণ শীতেও
কালবৈশাখী ঝঞ্ঝার সুরে উন্মাদ-প্রাণ
সঙ্গী আমার, আমরা খেলেছি জীবন-মৃত্যু খেলা।
গাছে গাছে ফুল ফুটিয়েছি, মাঠে মাঠে পাকা ফল
হাটে হাটে আমি ক্ষুধার ফসল
বিলিয়ে দিয়েছি, এই আমি, আহা হৃদয় আমার,
তোমারই মন্ত্র করেছি উচ্চারণ!
হাত ধ'রে তুমি কোথায় যে নিয়ে গিয়েছিলে, কোন্ আলোর শিবিরে
একবার শুধু দশটি দিনের অগ্নিগর্ভ শীতের তুষারে
দিন-বদলের চৈতালী উৎসবে।

দুই

তারপর সূচীভেদ্য অন্ধকার! নভেম্বরে, শীতে
সর্বত্র তুষার ঝরে; এপ্রিলেও সে দুর্দিন যায় না।
মে-দিনের বৈতালিকে কী আশ্চর্য, সমুদ্র গর্জায় না!
ইউরোপে, এশিয়ায়, কোথাও হৃদয় দিতে নিতে
মানুষ হাঁটে না আর। ইতিহাস কাঁথামুড়ি দিয়ে
সেই যে ঘুমাল; স্বর্গ-নরকের বিষণ্ন বিবাহ
কাঁসর-ঘণ্টার আর্তনাদ কিংবা কান্তের কান্নায়
সে নিদ্রা ভাঙে না আর। সস্তা ভাঙে আফিম মিশিয়ে
বিবাহ-বাসরে গড়াগড়ি যায় মাতাল-মিছিল,
কেউ বা হাতড়ায় শান্তি, কেউ বা গলিতে, নর্দমায়
দর্শন বমন করে। কেউ ক্ষুব্ধ, আন্‌বাড়ি যায়
মাঝরাতে কন্যাপক্ষ ক্রুদ্ধ, যদি ঘরে দিল খিল!

চার্চিল, ট্রুম্যান, শুর্মা অভ্যাগত বরযাত্রীর বেশে ;
শান্তির সানাই বাজে এমন কি দুর্ভিক্ষেরও দেশে।

তিন

হে হৃদয়, জ্যোতির্ময় ! এ অসহ্য তিমির-শায়ক
সাজে না তোমার তূণে ! তুমি যোদ্ধা আরেক শিবিরে
শ্রমিকের, কৃষাণের ! ঘৃণ্য চেতনায় ক্লান্তি ছিন্ন পোশাকের
মত ছুঁড়ে
আবার জ্বলবে না তুমি মধ্যদিনে অপরূপ হিরণ্যপাবক—

অগ্নিবর্ণ, অগ্নিচক্ষু, অগ্নি-উত্তরীয়
হে আমার দুর্দিনের প্রিয় ?

চার

তোমার জ্যোতি যেন ভোরের জবা
শীতেও যেই ফুল প্রভাতে সুধা ঢালে
তোমার গান যেন অরুণোদয়
রাত্রি ছিঁড়ে নীল আকাশে বাহু মেলে।

তা'হলে জাগো তুমি, তাহলে জ্ব'লে ওঠো
কবর থেকে ছাখো লেনিন মাথা তোলে—
কবর থেকে সেই মানুষ মাথা তোলে
পাহাড়ে, সাগরে ও তেরটি নদীকূলে।

৭ নভেম্বর, ১৯৫২

ভিসা অফিসের সামনে

দুটি মানুষ দুই পথে চলে গেল।
যতক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়
ওরা অপেক্ষা করেছিল।

একজন অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল,
আসি !
আরেকজন অনুভব করেছিল সৎভাইয়ের যন্ত্রণা।

দুটি কঠিন পাথরের মুখ,
খোদাই করা নিষ্প্রাণ দুই জোড়া ঘোলাটে চোখ,
অদৃশ্য রক্তের তোলপাড়ে একই অধিকারে মৃত পিতাকে স্মরণ করেছিল।

আর এখন, এমন দিনে
যদি সে মুখ আবার মনে পড়ে, রক্তে বাজে না-দেখার কঠিন ব্যর্থতা,
তখন কোথায় কোন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে
দুটি সৎভাই, সমস্ত আকাশটাই যেখানে দেয়াল দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা ?

প্রতিবাদ

এভাবে মানুষ নিয়ে খেলা
মানুষের স্বপ্ন সাধ বিশ্বাস সম্মান মনুষ্যত্ব নিয়ে
মানুষের মস্তিষ্ক হৃদয় নিয়ে
হৃৎপিণ্ড ধমনী রক্ত অস্থি নিয়ে
চক্ষু জঠর গর্ভ পৌরুষ মাতৃত্ব নিয়ে খেলা

গর্ভের সন্তান আর তারও পর যারা আসবে
আর যারা ইতিমধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে, বইখাতা নিয়ে স্কুল কিংবা কারখানায়
যে-সব শিশু বালক-বালিকা,
স্বাধীন দেশেই যারা জন্মেছে, স্বাধীন দেশে জন্মাবে,
তাদের স্বাস্থ্য ঘরবাড়ি পড়াশুনা নিয়ে
তাদের মুখের ভাত নিয়ে এই খেলা
জন্মভূমি নিয়ে, দেশের নগর গ্রাম খামার কারখানা নিয়ে

দেশের সীমান্ত নিয়ে, দেশের ভিতর
পোস্টাপিস রেলগাড়ী রাস্তাঘাট হাসপাতাল স্কুল-কলেজ নিয়ে
দেশের ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে
গান নিয়ে, ছবি নিয়ে, নুন আর রুটি নিয়ে
দেশের আকাশ জল মাটি আলো অন্ধকার নিয়ে
এই খেলা, এই ভয়ঙ্কর খেলা

এর চেয়ে আর কী নরক, স্বাধীন স্বদেশে !

১৪ অক্টোবর, ১৯৬৩

অন্নদেবতা

"অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতান্নমেব
প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা···"

ছান্দোগ্যোপনিষদ

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা ;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা ॥

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে ॥

অগষ্ট ১৯৬৪

স্বদেশ ২

গঙ্গানদী প্রবাহিত ; প্রবাহিত চিতা, শবদেহ
হরিধ্বনি। প্রবাহিত পুণ্যকামী পুরুষ, নারীর
পদচিহ্ন। নর্দমার চেয়ে পূতিগন্ধময় জলে
শান্তি। হাঁটু-অব্দি স্নানে স্নিগ্ধ হচ্ছে পাপীর শরীর ;

পাপ যাচ্ছে রসাতলে ; আত্মা হচ্ছে পদ্মের মতন।
পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে থুথু, মল, গলিত কুকুর ;
তবু প্রবাহিত…প্রাণ প্রবাহিত। স্বদেশ আমার,
মুখ দেখ্! এই তোর নদী, তোর পবিত্র মুকুর,

কলকাতার খাল ; যাতে আমরা বুক রাখছি, জন্মান্তর !
প্রবাহিত মনুষ্যত্ব…নরকের গর্ভের ভিতর।

মুখে যদি রক্ত ওঠে

মুখে যদি রক্ত ওঠে
সেকথা এখন বলা পাপ।
এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই।
এ সময়ে রক্তবমি করা পাপ ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো
বেঁকে যাওয়া পাপ ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ।

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজও ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।

আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায়, সারারাত।

কালো বস্তির পাঁচালি

১

কালো রাত কাটে না, কাটে না
এত ডাকি, রোদ্দুর এই পথে হাঁটে না—
ঘরে না, মাঠে না।

সূয্যি ঠাকুর, শোনো, সূয্যি ঠাকুর গো,
আমাদের খোকাখুকু তোমারও কি পর গো?

২

মাগো, এত ডাকি ক্ষিদের দেবতাটাকে
বেশি নয় যেন দু'বেলা দু'মুঠো নুনমাখা ভাত রাখে—
তুই আর আমি দুঃখ ভুলবো, ভুলবো পেটের জ্বালা;
ক্ষিদের দেবতা, সে কী একেবারে কালা!

বাছা রে, আমরা অচ্ছুৎ, তাই যেভাবে যতই ডাকে
কোনো দেবতাই বস্তিতে আসে নাকো।

৩

আয় রোদ্দুর, আয়।
আয় আমাদের ন্যাংটা খুকুর নোংরা বিছানায়।
আয় রোদ্দুর, বস্তিতে—
আধমরা ঐ খুকুর ঠোঁটে একটু চুমুর স্বস্তি দে।
আয় লক্ষ্মী, আয় রে সোনা!
এইটুকুতেই জাত যাবে না।

আয় রোদ্দুর, আয়!
দারুণ শীতে খুকু মোদের ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
আয় রে শীত মাড়িয়ে—
ভয়ের জুজু ডাইনী বুড়ীর চুল ধ'রে দে তাড়িয়ে।

আয় লক্ষ্মী, আয় রে সোনা।
রাত গেলে কী ভোর হবে না?

৪

শূন্য উঠান শূন্য মাচা
শূন্য ভাঁড়ার ঘর;
এমন দিনে বাছা রে তোর
এ কোন্ কঠিন জ্বর?

এর ঝাঁটা ওর লাথি খেয়ে
বেড়েছিস্ তুই ছেলে;
বাঁচবি কি তুই এই জ্বরেও
উপোসে দিন গেলে?

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর…
আমি কি তোর মা?
চোখের জলে ঘর ভেসে যায়
তাপ তো কমে না।

ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ দাউ
কান্না-ভেজা ঘরে;
মায়ের কোলে দুধের শিশু
দুধ ছাড়া আজ মরে।

বাইরে বাতাস আছড়ে পড়ে…
আমি কি তোর মা?
ঝাঁটা সইলাম, লাথি সইলাম
কী-জন্যে সোনা!

১৯৬০

রুটি যখন অনেক দূর

রুটি যখন অনেক দূর, নীল আকাশের চাঁদ
সোনা, তুই জন্মালি এই দেশে।
ওরে মাণিক পরাণ ভ'রে রুটির জন্য কাঁদ ;
নয়নে রুটির আলো, তবে তুই স্বপ্নে ওঠ হেসে !

শিক্ষক ধর্মঘট

ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা উজ্জ্বল স্বদেশ
সতেরো বছর
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
সতেরো বছর
পবিত্র স্বদেশ, সকল দেশের সেরা
সতেরো বছর
স্বাধীন স্বদেশ :
ঘর জ্বলে, পেট জ্বলে, রাজপথ জ্বলে
অন্নহীন মানুষের উপবাসে, উলঙ্গের হাহাকারে
মার খাওয়া রক্তাক্ত মিছিলে।

একটি আত্মার শপথ

[ভ্রাতৃহত্যার প্রতিরোধকালে নিহত আমীর হোসেন চৌধুরীর স্মৃতিতে নিবেদিত]

'মারতে জানা যত সহজ
মরতে জানা তত সহজ নয় ?
তাই কি ভাবিস, তাই কি দেখাস ভয় !

'এইটুকু তো বুকের মণি
তাকেই আবার টুকরো করা চাই ?
ভুলেই গেছিস ওরা আমার ভাই !

'মারতে জানা সত্যি সহজ,
মরতে জানা আরো সহজ যে—
নে রে মূর্খ আমার জীবন নে !'

এই বলে সে চলে গেল, রক্তে-ভাসা বুকের মণি তার
কাঁপিয়ে দিল বুড়িগঙ্গার ভাগীরথীর পাষাণ অন্ধকার।

মানুষ

তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে ;
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।

তবু সে এখনো মুখ
দেখে চমকায়,
এখনো সে মাটি পেলে
প্রতিমা বানায়।

মহাদেবের দুয়ার

১৫
এক এক বছর যেন চোখের জলের
পিছল সমুদ্র যায়
হাহাকারে, প্রলয়ে, তুফানে, শূন্য ভবিষ্যতে

নদীগুলি ভয়ানক শুষ্ক, পিপাসায়
কাছে গেলে ধমকে, গর্জনে
চক্ষু লাল করে।

স্বাধীন স্বদেশে ঘরে ঘরে
শোনা যায় আদিঅন্তহীন, দিগ্বলয়চিহ্নহীন মৃত্যুর গর্জন !

২৫

অন্ধকারে দেখা যায় না
তবু
অনুভব করা যায়
চোখের জলের নদী প্রবাহিত
এইখানে।

পরিত্যক্ত মৃতদেহগুলি
হঠাৎ বাতাসে
কেঁপে ওঠে, আর
শূন্য বেহুলার ভেলা ভেসে যায়
নরকের দিকে, দারুণ দুর্ভিক্ষে,
অসহায়।

৩৮

র'য়েছে বুকের মধ্যে তোর নাম
রক্তের সমুদ্রে শুয়ে
মাঝে মধ্যে ভীষণ তোলপাড় হয়
তারপর অসম্ভব শান্ত, যেন স্থির ছবি।

কখনো দু'চোখ ভ'রে ঘুম নামে
তোর স্মৃতি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়, মুছে যায়
ছেড়ে আসা সমুদ্রের অতিদূর চোখের জলের মতো !

আর কতোকাল তুই এইভাবে ভাসতে থাকবি
রক্তের ওপর, লবণাক্ত, সহোদর !

৪০

চোখের জলের সাগর
হিম সাগর

কেন বিষের লবণে জলিস
তৃষ্ণা ঢেকে !

বুকের মধ্যে থেকে থেকে
সাপের ছোবল,
ঢেউগুলি আছড়ায় ;
কোথায় যেন নরখাদক ক্ষুধায় আকাশ ছেঁড়ে !

অনেক দূরে মাটির দেশ, স্বপ্নের চাষীরা
সেখানে বীজ বোনে,
ভালবাসার শিশুরা গান গায়…
অনেক দূরে !

রম্যাঁ রলাঁ : মানুষের নাম

নিরন্নের দেশে, উলঙ্গের দেশে, নিরাশ্রয় মানুষেরা হাত-পা-ভাঙা, বোবা, মুখে রক্ত তোলে আর দীর্ঘশ্বাস ঘরে ঘরে ; আর শ্মশানের শান্তি, আর স্বাধীনতা দানবের, পশুর, সাপের ভয়ঙ্কর স্পর্ধা, ভয়ঙ্কর মৃত্যুর গর্জন !
সকলেই বিকলাঙ্গ, নষ্ট, ক্রীতদাস, সকলেই নতজানু রক্তচক্ষু কুকুরের আস্ফালনে, এমন কি কবি আজ বেশ্যার সমান, নতজানু ; অন্ধকার দেশে আমরা সবাই পলাতক নেড়িকুত্তা, দূর থেকে লেজ নাড়ি আর দয়া ভিক্ষা চাই ইতর মন্ত্রীর কাছে, তার পোষা সর্দারের কাছে ; নতজানু, আমরা কর্তব্য শিখি—স্বদেশের নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, পবিত্র সংবিধান, আইন, স্বাধীনতা, স্বদেশের নিরাপত্তা, স্বদেশের…নিরন্নের দেশে, উলঙ্গের দেশে।
সত্যিকারের মানুষের নাম আমাদের মুখে আজ মানায় না, যে মানুষ প্রাণ থাকতে মাথা নত করেনি পশুর, দানবের রক্তচক্ষু দেখে ; বরং জীবন দিয়ে গেছে।

[সংক্ষেপিত]

মে দিন ১৯৬৫

আয় কালবৈশাখী হাওয়া, উড়িয়ে নে
শুকনো আবর্জনা, ধুলো, মৃত্যু, অপমান !
আন বুকে স্পর্ধা, কণ্ঠে জীবনের গান
অন্ধ, বোবা আমার স্বদেশে !

চারদিকের ক্লান্তির শব্দ, শুধু পাতা ঝরে
আর অন্ধকার, আর গভীর কুয়াশা ;
আর মার-খাওয়া স্বপ্ন, রুগ্ন প্রেম, শীর্ণ ভালবাসা
মুখে রক্ত তুলে মাথা তুলতে চায়, ফিরে মার খায়, ফিরে রক্তবমি করে !

আয় কালবৈশাখী হাওয়া, ঝড় আন্‌
বুকের ভিতর, ভারতবর্ষকে দেখি অন্যভাবে, শপথে আলোকে ।
কে আর অনন্ত কান্না পুষে রাখে, পুড়ে যায় শোকে ?
চারদিকে নবজন্ম, দেশে দেশে শঙ্খ বাজে, শোন। যায় মানুষের গান ॥

ভিয়েতনাম : ভারতবর্ষ

অন্ধকার আমার স্বদেশে
নিরন্নের উলঙ্গের হাহাকার
আর উন্মাদের অস্থির হাসির শব্দ ছাড়া
অন্য কোনো শব্দ নেই ।

এ সময়ে কোথায় মানুষ মাথা উঁচু ক'রে
পথ হাঁটে, মাথা উঁচু রাখতে হবে ব'লে
পশুর দাঁতে ও নখে ছিঁড়ে যেতে যেতে
জ্বলে ওঠে পবিত্র ঘৃণায়,
কিছুই বুকের মধ্যে অনুভব হয় না ।

আমার ঘরেও আজ সৈরিন্ধ্রী বাঁধে না চুল
কিন্তু আমি দীর্ঘদিন বিরাট রাজার নাচঘরে
নপুংসক, নাচ শেখাই, আর যন্ত্রণায় জ্বলি
আর ভেসে আসে শব্দ—
নিরন্নের উলঙ্গের হাহাকার, উন্মাদের হাসি ॥

লেনিন

যে দেশে শিশু জন্ম নিলে
জননীর মুখের হাসি মাণিক হয়ে ঝরে
যে দেশে শিশু জন্ম নিলে
পড়শীদের প্রতি ঘরে শাঁখ বাজে, এয়োতিরা উলু দেয়

সে দেশের একটি মানুষ অনেকদিন কবরের নিচে শুয়ে আছেন
কিন্তু তিনি কখনো ঘুমোন না, পাহারা দেন

যেন কোনো জননীর মুখের হাসি চোখের জল না হয়।

আমার ভারতবর্ষ

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমুতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে।

কত রাজা আসে যায় ইতিহাসে, ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায়
ক্রমে অন্ধকার হয়!

চারদিকে ষড়যন্ত্র, চারদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায় !

আমার ভারতবর্ষ চেনেনা তাদের
মানেনা তাদের পরোয়ানা ;
তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে চারদিকের প্রচণ্ড মারের মধ্যে
আজও ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর।

তেরো নদীর জল

স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম তাকে
মাটির সরায় আঁকা আমার মা
মাথার ওপর কোজাগরীর আলো
পায়ের পদ্মে জলের যন্ত্রণা।

অসহ্য এক চেতনার উন্মাদ
আদেশ ক'রল, ওঁকে প্রণাম কর্ !
আমি বললাম, ও-যে আমার মা—
আমার এখন সারা অঙ্গে জ্বর !

কোলের ওপর লুটিয়ে দিলাম মাথা।
মা গো, কোথায় শান্তি কোথায় সুখ ?
দেখিস নে তুই অনাহারের জ্বালা
চোখ চাইতে কাঁপে না তোর বুক ?

স্বপ্ন ভাঙল ; তেরো নদীর জলে
বুক ডুবিয়ে ক্ষুধার মিছিল চলে।

ভারতবর্ষ

মণি, আমার মণি
কেন রে তুই কাতর ?
কপালে দিই চুমা
এবার মণি ঘুমা ;
স্বাধীন হ'তে বুক করেছি পাথর ।

মণি, আমার মণি
ক'দিন উপবাসী ?
জ্বরে পুড়ছে গা
চুমায় সারে না ;
স্বাধীন দেশে চোখের জল-ও বাসি ।

কেবল খোঁজে এক মুঠো ভাত

এই যদি রে ফুল ফুটেছে
এই যদি রে নীলকণ্ঠ পাখি
আলোয় মুখ তুলেছে, ভালবাসার আবীরে
গাছের ছায়ায় নদীর জলে ভরেছে তিন ভুবন ;
এই যদি রে তুষার গলে, পাহাড়ে শান্ত সম্মোহন
করুণাধারা, চোখের জল…

কিন্তু তার শুষ্ক চোখ, ফুল দেখে না, নদী দেখে না
ভালবাসার আবীরে আর রাঙে না রে ;
কেবল খোঁজে এক মুঠো ভাত, এক মুঠো ভাত, এক মুঠো ভাত !

জন্মদিন

(অক্টোবরের দিনগুলি মনে রেখে)

মানুষের মুখের ওপর
আলো পড়ে, চোখের জলের ম্লান স্বপ্নগুলি
প্রত্যাশায় কেঁপে ওঠে, মনে হয় বুকের পুরানো ক্ষতচিহ্ন, গ্লানি
এইবার রৌদ্রে ধুয়ে যাবে, নব কিশলয়ে বৃক্ষের বাহার
অমল আশ্রয় দেবে সব মানুষের স্বপ্নের কান্নাকে।

একি শুধু দিবাস্বপ্ন ? অর্ধশতবর্ষ ধ'রে এই শঙ্খধ্বনি
ঘরে ঘরে একটিই শপথ, জন্মদিনের প্রত্যুষের অবাক্ স্বপ্নগুলি
উচ্চারিত হ'য়ে যায়, তবু মানুষের বুকের ভিতর বিষ হয়, মুখে রক্ত ওঠে
রৌদ্র চলে গেলে ; দেখি পত্রহীন পুষ্পহীন বৃক্ষের শাখায়
শীতের প্রচণ্ড স্পর্ধা !

কোনো আলো স্থির নয়, কোনো ভালবাসা গ্লানিমুক্ত নয়···
কোনো বৃক্ষ চিরহরিৎ প্রার্থনা নিয়ে ঈশ্বরের সমান উদাত্ত নয় ?
চোখের সামনে ভোর, জন্মদিন তবে শুধু
অনুষ্ঠান, কবির বাহবা !

ভাল ক'রে কিছুই জানি না, আমি অদীক্ষিত কবিয়াল, সভা নয়,
শুধুই প্রার্থনা জানি
আর জানি, অন্ধকার ধুয়ে দিতে বুকের মধ্যে যেই গান জাগে—
বারবার ঢেকে যায় শব্দহীন কুয়াশায়, অসহায়, নিয়তি আমার !

উত্তরপাড়া কলেজ : হাসপাতাল

রক্ত রক্ত শুধু রক্ত, দেখতে দেখতে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়
শিক্ষক ছাত্রের রক্ত প্রতিটি সিঁড়িতে, ঘরে, চেয়ারে, চৌকাঠে বারান্দায় !
দরজা ভাঙা, জানলা ভাঙা, ছাতের কার্নিশ ভাঙা, আহত ছাত্রের
মাথা ঠুকে ঠুকে তারা খসিয়েছে ইট সুরকি ! রক্তাক্ত মাথায়

কেউ লাফ দিয়েছে বিশ ফুট নীচে, কাউকে ছুঁড়ে দিয়েছে পুলিস ;
রক্তবমি করে আজ হাসপাতালে এই বাংলার কিশোর গোঙায় !

এই তোমার রাজত্ব, খুনী ! তার ওপর কি বাহবা চাও ?
আমরাও দেখব, তুমি কতদিন এইভাবে রাক্ষস নাচাও !

বাছা আমার

বাছা আমার
গিরগিটির ছা ;
যখন যেমন
রঙ বদলায় ।

এই মাঠে, ঐ
মাচায় উঠে
রামধুন গায় ।

সোনা আমার
পারলে কিন্তু
মানুষও খায় ।

কার মুখ দেখে ভোর হবে,
ডিসেম্বর ? কোন ঘোষ অথবা সেনের ?
ঘোষ তো অনেক ;
আর সেন ?
সেখানেও উপস্থিত আমাদের প্রাক্তন আরেকজন,
কুলীন বল্লাল ! পেছনে ঘুপটি মেরে রায় রাজবল্লভ ;
মাঝে মধ্যে ঘোমটার আড়াল দিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লী
পুনরায় দিল্লী থেকে কলকাতা !

তুমি কার মুখ দেখে উঠবে হে।

এদিকে সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে
ফড়ে আর বেশ্যাদের নাচ! নাচে সেন-ঘোষেদের
পিতৃতুল্য শেঠজী আগরওয়াল
আর নাচে হুমায়ুন ধর্মবাপের শ্বেতপাথরের বৈঠকখানায়।
নাচতে নাচতে সকলেই সোনার বাংলার বস্ত্র কাড়ে, তাকে
সম্পূর্ণ উলঙ্গ ক'রে মজা দেখে
আর উন্মাদ জগাই মাধাই, দুই ভাই,
হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যায়
নিজেদের বাহবায়!

তুমি কি এদেরই মুখ দেখে আজ ভোরবেলাকে
নরকের মতো জানবে, ডিসেম্বর? নাকি নরপশুদের বাহবা ছাড়িয়ে
ঊর্ধ্বে আন্দোলিত
ঐ টকটকে নিশান
মানুষের রক্ত লাগা, হাজার ছাত্রের খুনে লাল, সাতরাজার ধন এক মানিক
বুকের মধ্যে নিয়ে, যায় যাবে জীবন ব'লে বাংলার নভেম্বরের লজ্জা ঝেড়ে ফেলে
চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়াবে নির্জন!...চারদিকে নক্ষত্র ধ্যানালীন
একটি সূর্যের স্তবে। জয় হবে। নতুন জন্মের। মানুষের।

[সংশোধিত]

জেলখানার কবিতা

একজন কিশোর ছিল, একেবারে একা
আরও একজন ক্রমে বন্ধু হল তার।
দু'য়ে মিলে একদিন গেল কারাগারে;
গিয়ে দেখে তারাই তো কয়েক হাজার

জল দাও

দিঘি ভর্তি জল, সত্যিকারের জল
গাছের পাতায় সত্যিকারের হাওয়া ;
তুমি মন্ত্র জানো।

কত দিন যে জল দেখি নি, রোদ দেখিনি—
মাথার ওপর সত্যিকারের সূর্য ওঠা!

কত দিন যে বুকের মধ্যে বাতাস মানে শুধুই বিষ,
কত দিন যে নরকবাস হ'লো! তুমি সত্যি ক'রে বলো,
বাংলা দেশের পুকুর আবার জলে ভ'রবে ?
রোদে হাসবে আকাশ ?

নাকি ম্যাজিক, শুধুই ম্যাজিক, শুধুই চোখের জল!

দেয়াল

সম্পূর্ণ আকাশটাকে ঘিরে ফেলছে
হাজার শকুন
যেখানে ঝরেছে খুন, ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা

মাঝখানে দেয়াল

এদিকে আগুন জ্ব'লছে, মুখ দেখছে নিশি-পাওয়া এক লক্ষ মানুষ

গোর্কির জন্য

প্রতিটি রুটির টুক্‌রো রক্ত মাখা
প্রতিটি ধানের শিষ, গোলাপ, রজনীগন্ধা, সব এক রকম।
এমন কি কুয়াশার মুখগুলি দেখি যত সভায়, মিছিলে
আজ রক্তচন্দনের শোভা।···গনগনে উনুনে সেঁকা,
আগুনের চেয়েও গরম
মেঘ নাচে আকাশে, লালে লাল, দেখি এ কোন বিহান!

প্রতিটি রুটির টুকরো, প্রতিটি ধানের শিষ জ্বলে যেন
ফিনকি দেওয়া খুনের নিশান।

২৯ নভেম্বর, ১৯৬৭

লাল টুকটুক নিশান ছিল

লাল টুকটুক নিশান ছিল
হঠাৎ দেখি, শ্বেত কবুতর
উড়ছে উর্ধ্বে, আরও উর্ধ্বে
ভুখ মিছিলের মাথার ওপর।

বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী,
কিন্তু এখন 'শান্তি, শান্তি।'
প্রেতের মতো ধুঁকছে মিছিল
উড়ছে পায়রা নধরকান্তি।

জেলখানার কবিতা ২

এক

পায়রাগুলি বকম বকম করে
চড়ুই বসে ভাতের থালার একটু দূরে;

হুলো বেড়াল, শিশু বেড়াল উপুড় হয়ে বসে
প্রতীক্ষায় থাকে।

বারো নম্বর ওয়ার্ডে সবাই খেতে বসেছে ;
চারদিকে তার রৌদ্রের উৎসব।

দুই

খুনী কি কখনো রাত জাগে
একা
যখন চারদিকে মহা নৈঃশব্দ, মহৎ শান্তি
শুধু তারই হাত
রক্তমাখা !

খুনী কি কখনো ধুয়ে দিতে পারে
হাত থেকে তার
শিশুর, ছাত্রের, জননীর রক্ত
স্বদেশের হীন অপমানে ?

নাকি সারারাত
অঘোরে ঘুমায় হত্যাকারী
নিশ্চিন্ত নরকে !

তিন

ক'টা বাজল ? গেটের সামনে
এখনো পাহারা ! কালো মুখ করে
সেপাই দাঁড়িয়ে আছে। সুপ্রভাত !
ক'টা বাজল মশাই হে ? এদিকে অনেকক্ষণ
সূর্য উঠে গেছে !

গেট খুলে গেলে আমরা একটু আধটু রোদ পাব
যদিও গেটের বাইরে গেট, পথ হাঁটলে

আবার লোহার দরজা! ডাইনে বাঁয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী,
মিশতে বারণ।...
তবু গেট খুলে যাওয়া ভাল; বাইরে একটু পায়চারি করা যাবে

মশাই হে! রাস্তায় হাঁটবার গেট খুলে দাও।

চার

জনৈকের জন্মদিনে

কারার আড়ালে জন্মদিন
বাজায় ভোরের শঙ্খ?
তোমার, আমার, পৃথিবীর
সব মানুষের
মুখের ওপর এই ভোর
কাঁপে না কি?

আমরা তো স্বপ্ন দেখি
স্বদেশের প্রতি ঘরে একটি জন্মদিন

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
৩০-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

উলঙ্গের স্বদেশ

The proletariat has nothing to lose but his chain.
—Communist Manifesto

এক অদ্ভুত মাটির ওপর
আমরা দাঁড়িয়ে আছি;
অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য
প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

এ মাটির গর্ভে কী আছে
আজও আমাদের জানা নেই;

যদিও কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায়
এক লক্ষ সাপের গর্জনের চেয়েও
কোন ভয়ঙ্কর পরিণাম, যা ক্রমেই আসন্ন হচ্ছে।

কিন্তু আমরা এক পাও এদিক ওদিক
নড়ছি না ; যেন স্থির দাঁড়িয়ে থাকাই
আমাদের নিরাপত্তা, এবং তা সম্ভব। আমরা গির্জার গম্বুজগুলির
এবং স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট স্তম্ভগুলির দিকে
বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে
এক সময় ঈশ্বরের মহিমাকে জানতে পারছি
আর এই কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হচ্ছি,
আমাদের স্বদেশ স্বাধীন এবং তার সীমান্তে
বন্দুকধারী প্রহরীরা প্রত্যহ টহল দিচ্ছে।

যদিও পায়ের নিচে মাটি এখন অগ্নিগর্ভ ;
যদিও আমাদের মাথার ওপর আকাশ বলতে কিছুই নেই।

জন্মভূমি

তিমিরবিনাশী তুই, জন্মভূমি।
মেলাস বুকের পদ্ম, দিঘির কান্নাকে
শিশুর মুখের রৌদ্রে, শান্ত
ঊষার আগুনে।

রাত্রি ভোর হয়
পদ্মের পাতায়, জলে। মন্ত্রগুলি
অবাক ভোরের পাখি, আর
আগুনের রঙে রাঙা মানুষের শোক ! জন্মভূমি,
তোর পায়ে মাথা রাখতে সাধ হয়।

তোর পায়ে মাথা রেখে জেগে উঠতে সাধ হয়
ফুলের, ফলের ;
সবুজ শস্যের গানে ধানক্ষেতগুলি
বুকের বসন খুলে ডাক দেয় পৃথিবীর কালো সাদা হলুদ শিশুকে ।

তুই তিমির-বিনাশী ! তাই কুরুক্ষেত্রে প্রতিটি রক্তের ফোঁটা
এমন নির্মল !

কোজাগর পূর্ণিমা

তরাই থেকে দার্জিলিং
কোজাগরের আলোয় আলো
বাংলা দেশ

কোথাও নেই একটি ফুল
আশ্বিনের ; কোথাও নেই
আঙিনা জুড়ে লক্ষ্মীর পা ;

শুধু শ্মশান !

দেয়ালের লেখা

দেয়ালের লেখাগুলিকে
কারা যেন মুছে দিতে চাইছে ।
কারা যেন
বত্রিশ সিংহাসনের প্রচণ্ড স্পর্ধায় চক্ষু লাল ক'রে
নির্দেশ দিচ্ছে : 'এবার থামো ;
এখন থেকে বিপ্লব আমাদের হুকুম মেনে চলবে' ।

একবার সিংহাসনে উঠে বসতে পারলে
তখন দেয়ালের লেখাগুলি অশ্লীল প্রলাপের মতো মনে হয় ।

তখন অপরের পোস্টার ছেঁড়াই শ্রেণী-সংগ্রামের কাজ ;
অথবা ডজনখানেক মন্ত্রী জড়ো ক'রে রাস্তায় বক্তৃতা দেওয়া :
'সাবধান ! যারা দেয়ালকে কলঙ্কিত করছ ! তোমাদের পেছনে
এবার গুণ্ডা লেলিয়ে দেব ।'

তারা বত্রিশ সিংহাসনের আশ্চর্য মহিমায়
এখন থেকে বাংলা দেশের তামাম দেয়ালগুলোকে
নতুন করে চুনকাম ক'রে দেবে, যেন কোথাও কোনো
গুলি খাওয়া মানুষের রক্ত
ছিটে ফোঁটাও দাগ না রাখে ।

ভিক্ষার মিছিল যায়

আসমান ছেয়ে গেছে
পতাকায়, ফেস্টুনে, গর্জনে ;
মনে হয় দৃপ্তের দর্পণে
বুঝি দ্রুত পৃথিবী বদলায়—

কুয়াশায়
ও শুধু চোখের ভুল । যা দেখিস,
ভিক্ষার মিছিল যায় ।

রক্তাক্ত মুখোশ

সবুজ গাছের পাতাগুলি
বারুদের গন্ধে, খোঁড়া সিংহের গর্জনে
বমি করে
কৃষ্ণকায় মানুষের অভিশাপ ;

মাটি
লাল হয় হাজার হাজার গর্ভিণীর
ভ্রূণের চিৎকারে…

বোবা
সূর্য ওঠে প্রকাণ্ড পতাকা
উড়িয়ে ;
আফ্রিকা
যখের ধনের মতো আগলায়
রক্তাক্ত মুখোশ।

জেলখানার ডায়েরী / হো চি মিন

(অংশ)

খাড়া পর্বত ভেঙে আমি পাহাড়গুলির চূড়ায় উঠেছি।
কী করে বুঝব, তরাইয়ে আরো বিপদ অপেক্ষা করছে ?
পাহাড়ে বাঘের মুখোমুখি হয়েছি, গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি ;
মুক্ত প্রান্তরে এসে দেখা হ'ল মানুষের সঙ্গে, আব তারাই
আমাকে ছুঁড়ে দিল একটা জেলখানায় !

জেলখানায় পুরণো বাসিন্দারা নতুন কয়েদীদের অভ্যর্থনা জানায়।
আকাশে সাদা মেঘেরা কালোদের পিছু-ধাওয়া ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে।
সাদা মেঘ, কালো মেঘ, সবাই আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।
নিচে, পৃথিবীতে, স্বাধীন মানুষদের ঠেসে জেলখানায় ভরতি করা হচ্ছে !

রোজ ভোরবেলায় বাইরের দেয়াল বেয়ে সূর্য ওঠে,
ফটকের ওপর তার উজ্জ্বল রশ্মি ছুঁড়তে থাকে ; কিন্তু ফটক
একই রকম তালাবন্ধ।

জেলখানায় কয়েদীদের ঘরগুলি গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন !
কিন্তু আমরা জানি, বাইরে উদয়-সূর্য আলোর হাট বসিয়েছে।

রাত দশটায় পাহাড়চূড়ায় সমাসীন কালপুরুষ
ঝিঁ ঝিঁদের গান কড়ি ও কোমলে রচে আশ্বিন-স্তোত্র।
বাইরে ঋতুর পরিবর্তনে কিবা আসে-যায় বন্দীর
সে শুধু একটি স্বপ্নই দেখে, কোন দিন হবে মুক্ত।

নিহত কবির উদ্দেশে

যারা এই শতাব্দীর রক্ত আর ক্লেদ নিয়ে খেলা করে
সেইসব কালের জল্লাদ
তোমাকে পশুর মত বধ ক'রে আহ্লাদিত ?
নাকি স্বদেশের নিরাপত্তা চায় কবির হৃৎপিণ্ড ?

তবে শাস্তি ! কার শাস্তি ? হাজার কুকুর ঘোরে
দুর্ভিক্ষের নবাবী বাংলায়
গান গায় দরবারী কানাড়া, লেখে পোশাকী কবিতা—

তুমি মৃত ! বহুদিন কবিতা লেখ নি। বহুদিন
পরিচ্ছন্ন পোশাক পরো নি ; ঘুরেছ উন্মাদ হ'য়ে
উলঙ্গের, নিরন্নের দেশে—তাই মৃত—তুমি পোশাক ছেড়েছো
তার অপরাধ·

আজও খুনী হেঁটে যায়

আজও খুনী হেঁটে যায় প্রত্যেকের চোখের সামনে
মায়ের চোখের জলে, শিশুর লোহুতে ভাসা আমার স্বদেশে

কেউ নেই তাকে প্রশ্ন করে, কেউ নেই প্রকাণ্ড রাস্তায় তার কাঁধে
হাত রেখে বলে, 'তোমার বিচার হবে।'
কেউ নেই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘৃণায় ক্রোধে জলে ওঠে।

সকলেই যে যার অন্দরে ব'সে তার জন্য নিরাপদ নিন্দার বাহবা
ছুঁড়ে দেয়; কিংবা সভা ক'রে তার নামে নিজেরা উজ্জ্বল হয়।

কেউ নেই মাতাল গুণ্ডার মুখ থেকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দেয়
রাজার মুখোশ; যখন শ্মশানে হরিধ্বনি ভেসে আসে আর শিশুর মুখের ওপর
স্থির হয় উর্ধ্বে সপ্তর্ষির, কালপুরুষের একটিই প্রতীক্ষা।

সকলেই চিতার আগুন নিভিয়ে কলসীর জলে
ঘরে ফেরে, ভোরবেলার কাগজে দেখবে ব'লে মৌন-মিছিলের ছবি।

গুলি চলছে

গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে—এই না হলে শাসন?
ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বন্ধ
গুলির মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই!
দেশের মানুষ না খেয়ে দেয় ট্যাক্স, গুলি কিনতে, পুলিশ ভাড়া করতে,
গুণ্ডা পুষতে ফুরিয়ে যায় তাই।
একেই বলে গণতন্ত্র; এরই জন্য কবিতার সর্দার সাহিত্যের মোড়লেরা
কেঁদে ভাসান; যখন
গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই!

জন্মভূমি আজ

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয়নি ;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিশ্বাস নিতে পারছো না।
মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।
তুমি যে ভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ঙ্করকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও—
তুমি ভয় পাওনি।

মাটি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।
যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে ;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে

আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভাড়াটে জল্লাদ ;
উপড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবা-দ্বিপ্রহরে
নিশাচর শ্বাপদেরা ; করুক আহ্লাদ
তার শৃঙ্খলিত ছিন্নভিন্ন হাত-পা নিয়ে
শকুনেরা। কতটুকু আসে-যায় তাতে
আমার, যে আমি করি প্রত্যহ প্রার্থনা,
'তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'

যে আমি তোমার দাস ; কানাকড়ি দিয়ে
কিনেছ আমাকে রানী, বেঁধেছ শৃঙ্খলে
আমার বিবেক, লজ্জা ; যে আমি বাংলার
নেতা, কবি, সাংবাদিক, রাত গভীর হ'লে
গোপনে নিজের সন্তানের ছিন্ন শির
ভেট দিই দিল্লীকে ; গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে
ভোর বেলা বুক চাপড়ে কেঁদে উঠি, 'হায়,
আত্মঘাতী শিশুগুলি রক্তে আছে শুয়ে !'

আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে আশ্চর্য চুমায়
তোমারই দাক্ষিণ্য, রানী, দিয়েছ নিভৃতে ;
এবার পাঠিয়ে দাও প্রকাশ্যে ঘাতক,
বাগানে যে-ক'টি ফুল আছে ছিঁড়ে নিতে।
প্রত্যেক কাগজে আমি লিখবো ফুলের
ভেতরে পোকার নিন্দা, খুনীর বাহবা
প্রত্যহ বাংলার শিশু-গোলাপ ক'টির
সর্বনাশে সরগরম করবো আমি সভা।

আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভাড়াটে জল্লাদ,
উপড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবা-দ্বিপ্রহরে
নিশাচর শ্বাপদেরা, করুক আহ্লাদ
তার শৃঙ্খলিত ছিন্নভিন্ন হাত-পা নিয়ে
শকুনেরা। কতটুকু আসে-যায় তাতে
আমার, যে আমি করি প্রত্যহ প্রার্থনা,
'তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'

স্বদেশ প্রেমের দীপ্ত মহিমায়

'I smell dark police in the trees'.

কে তুমি হে ! দেবদারু বীথিতেও গন্ধ পাও কালো পুলিশের ?
তোমার অসীম স্পর্ধা ! জাননা কি এখন স্বদেশ
ভিতরে বাহিরে নিষ্প্রদীপ, তার বাতাসে বিষের ধোঁয়া…
কে তাকে বাঁচাতে পারে যদি না পুলিশ ঢালে বৃক্ষের শিকড়ে গ্যালন গ্যালন রক্ত ?

কার রক্ত—নির্বোধের মত প্রশ্ন কর তুমি। দুধ কলা দিয়ে পোষা
সাপ তারা। দেবশিশু তোমার চোখের ভ্রম ! ওরা কেউ শিশু নয়, জানে
তা পুলিশ, জানে দিল্লীর ঈশ্বরী।

তুমি অন্ধ ! তাই গাছের পাতায় কালো ছায়া দেখ, গোলাপেও পুলিশের
গন্ধ পাও, যে সুবাস পবিত্র, নিহত পশুর রক্ত। যার চোখ আছে, দেখে
কলকাতায় পার্কে ময়দানে রাজভবনে অথবা এঁদো গলির
বস্তির মুখ আলো ক'রে
যেখানে যা বৃক্ষ আছে, ঈশ্বর-প্রতিম তারা, স্বদেশ-প্রেমের দীপ্ত মহিমায়
জ্বলে যেন ত্রিবর্ণ পতাকা !

মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে

'The earth is filled with mercy of god.'

অসীম করুণা তার, ঐ বধ্য-মঞ্চ, যাকে বলি মাতৃভূমি ;
জল্লাদেরা প্রেম বিলায় কোলের শিশুকে, তাঁর লীলা !
কবিরা কবিতা লেখে, দেশপ্রেম, ক্রমে গাঢ়তর হয় গর্তের ভিতর রক্তপাত—
মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে, 'রঙ্গিলা ! রঙ্গিলা !
কী খেলা খেলিস তুই !'
যন্ত্রণায় বসুমতী ধনুকের মত বেঁকে যায়—
বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস লেনিন স্টালিন গান্ধী
এক এক পয়সায়…

যা লেখ কবিতা লেখ

যা লেখ যা ইচ্ছে লেখ কিন্তু খবরদার, দিওনা সাপের লেজে পা;
ব'লো না, নরখাদক বাঘ মানুষের মাংস খায়—
যা লেখ কবিতা লেখ কিন্তু কে তোমার মাথায় দিয়েছে দিব্যি, যা
কদাচ প্রকাশ্য নয়, এ ভর-সন্ধ্যায়, এই কাল বেলায়
করতে হবে উচ্চারণ? দেশের আপৎকালে এ সকল
গোয়াতু্র্মি ছাড় হে, যা লেখ, ইচ্ছেমত লেখ;
বদলেয়ার ভেঙে খাও, স্বপ্নে দেখ নাজিম হিকমত
অনুবাদ করো পাবলো নেরুদা
কিন্তু সাবধান! যদি আন্ বাড়ি যাও, যদি নিষিদ্ধ রক্তের
দিকে ভুল করে তাকাও, বলো
তোমার স্বদেশ বধ্যভূমি, দেশপ্রেম হাজার শিশুর রক্ত…
তোমাকে বাঁচাবে, মর্তে জন্মেনি সে অলীক দেবতা!

তুই

তোর কি কোনো তুলনা হয়
তুই
চোখ বুজলে হিম সাগর, চোখ মেললে অনন্ত নীল আকাশ!

বুকের মধ্যে সমস্ত রাত তুষারে ঢাকা পাহাড়
সমস্ত দিন সূর্য-ওঠার নদী…

তোর কি কোনো তুলনা হয়?
তুই
ঘুমের মধ্যে জলভরা মেঘ, জাগরণে জন্মভূমির মাটি!

আর এক নদীর অনুভব

পাষাণে বুক রাখিস্, কল্যাণী
শুনিস মত্ত বাঘিনী ডাকে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত
দেখিস জীবন-মরণ লড়াই রক্তমাখা পায়ের ছাপ !

বুক জুড়ে তোর তবু তৃষ্ণার জল
নরখাদক পশুর রক্ত ধুয়ে।

একজনকবি

চোখের বাইরে প্লাস মাইনাস পাওয়ার বদলায়
চোখের ভিতরে তার অনন্ত কুয়াশা
অন্ধকারও স্পষ্ট নয়, ভোরবেলায় ঘুম থেকে জেগে-ওঠা স্বদেশ, মানুষ
সাদা নাকি কালো; নাকি আলো থেকে আরো তীব্র জ্যোতির্ময়
স্বচ্ছ নয় ভিতর বাহির, শূন্য হৃদয়, কবিতা লেখে, কার জন্য লেখে
সে জানেনা; শুধুই বাহবা জানে, অঙ্ক ক'বে কবিতার
স্কুলমাস্টারি করা যায়
কেননা কথারা তার বাধ্য, যেন হাজার অবোধ শিশু, ঘণ্টা বাজলে
সবাই 'প্রেজেন্ট স্যার'—
জানেনা, কবিতা শুধু কথা নয়, অন্য অনুভব অন্য গভীরতা,
তার ভিতর বাহির পরিপূর্ণ ভালবেসে ;
জানে না, সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে ছায়া ফেলে ঘরে-ফেরা মানুষেরা,
ছায়া ফেলে, দীর্ঘ হয় জাগরণে রাত্রির স্বদেশ।

অন্ধকার জন্মভূমি

যত বৃষ্টি ঝরে তত গভীর কুয়াশা
তার চোখ

শোক বাড়ায় ; ছায়ার মত শীতল বিকেলে
শিশুর কান্নায় ঘর
ভেসে যায় ;

ভুবনেশ্বরী আমার !
এত অসহায়
বাংলার অঙিনা জুড়ে কালকেতু-ফুল্লরার
পাতানো সংসার ?

নাচ

তারা এক পয়সার ফানুস ওড়ায়
এক পয়সার দেশ ;
তারা এক পয়সার কন্যা নাচায়
মেঘবরণ কেশ !

তাদের এক পয়সার ছোঁয়া লেগে
নাচে রে কন্যা ;
নাচতে নাচতে আকাশ ভেঙে
অশ্রুর বন্যা !

হাজার শিশুর জন্মভূমি

হাজার শিশুর জন্মভূমি
পুড়ে যায় ক্ষুধার চিৎকারে
আর কান্নার গর্জনে !

কোথা থেকে আসে এত বাঘ ?

আমার পায়ের নিচে মাটি নেই

আমি শিশুকাল থেকে পরবাসী, মা গো !
কবে তোর স্তনে মুখ ছিল, কবে তোর বুক অমৃতের মত ছিল,
সব ভুলে গেছি ।
পরদেশে স্বাধীনতা বিষের মতই জ্বলে, আমার মুখের ভাষা
আমি তাই চিনতে পারি না ।

নদীর এপারে নষ্ট ভালবাসা, কুয়াশায় জন্মভূমি গভীর আঁধার ;
মা আমার ! কবে ভোর হ'য়ে গেছে ! আমার পায়ের নিচে
মাটি নেই—এ নরকে সব দৃশ্য স্বপ্ন মনে হয় !

লেনিন শতবর্ষের দু'টি কবিতা

১

কবর থেকে উঠে এলেন,
সামনে মহৎ সভা ।
অবাক হ'য়ে দেখেন তিনি
ভাষণ দিচ্ছে বোবা !

আরো অবাক, শুনছে যারা
জন্ম থেকে বধির তারা !

যে মুহূর্তে মুখ ফেরালেন
'হা হতোস্মি' ব'লে,
লক্ষ ঘোঁড়ার মিছিল গেল
তাঁকেই পায়ে দ'লে !

২

তিনি কি শুধু মুখের শোভা
অথবা তিনি বুক জুড়ে ?

তিনি কি আলো করেন সভা ?
নাকি দূরে…বহু দূরে
যেখানে বোবা শিশুরা হাসে
রোগা মায়ের কোল জুড়ে,
চোখের জল শুকোতে দেওয়া
ছেঁড়া কাঁথার রোদ্দুরে ।

শান্তি, ওঁ শান্তি

শান্তি, ওঁ শান্তি ! তুমি সর্বত্র বিরাজো
পশ্চিম বাংলার পীঠস্থানে ।
আহা ! সম্রাটের মহিমায় তুমি সাজো
যা অশান্তি, অবাধ্যতা তোমার চরণতলে পিষ্ট করতে যুগ সন্ধিক্ষণে !

আমাদের সন্তানের মুণ্ডহীন ধড়গুলি তোমার কল্যাণে ঘোর
লোহিত পাহাড় ;
আমরা সেই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে গাইব উলঙ্গের স্বদেশ-বন্দনা ;
'শান্তি, ওঁ শান্তি ! তুমি কি বাহার সেজেছ বাহার !'
আ মরি পশ্চিম বাংলা ! তোর রক্তে স্বদেশের নিরাপত্তা ; ঘরে ঘরে
সোনার আল্পনা !

এ দিনে, মানুষ নাম

(শ্রীযুক্ত অরবিন্দ পোদ্দারকে নিবেদিত)

মাথা উঁচু রাখতে হয় ঝড়ে, জলে
কুয়াশায়,
দশ দিকের কবন্ধ আঁধারে । কানে আসে
ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের হল্লা ; তিন ভুবন
মাছের বাজার, নাকি মানুষের মাংস নিয়ে
চলে কাড়াকাড়ি ! রাস্তায় রক্তের নদী

পার হয় জল্লাদেরা।   কবিরা কবিতা লেখে
শীতের কাঁথায় মুড়ি দিয়ে
আপাদমস্তক ; নেতারা বক্তৃতা দেয় ; ধূমাবতী জন্মভূমি
সর্বাঙ্গে ক্ষুধার অগ্নি দাউদাউ
ঝাঁপ দেয়—কোথায়—কে জানে ?

এদিনে মানুষ নাম
মনে হয় অশ্লীল তামাশা !   আমাদের সন্তানেরা
আমাদের চোখের সামনে
রক্ত মাংস কর্দম, অথবা আততায়ী—কাপুরুষ !   আমরা
গলিতনখদন্ত সিংহ
নিরাপদ, সার্কাসের খাঁচায়, ঘোলাটে চোখের মণি—
বিস্ফারিত—ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে আসে…

তবু মাথা উঁচু রাখতে হয়, নরকেও।   আমাদের চোখের আড়ালে
ক্রমাগত রক্তক্ষরণের
পিচ্ছিল নেপথ্যে আজও রয়েছে মানুষ—একা—নরক দর্শন করে,
তবু অন্ধ নয়, খোঁড়া নয় ;
রক্ত মাংস কর্দমের পাহাড় ডিঙিয়ে, নদী সাঁতরিয়ে
নরক উত্তীর্ণ হ'তে ক্লান্তিহীন যাত্রা তার ;

মাথা উঁচু রাখাই নিয়ম।

সমস্ত দিন, সমস্ত রাত

সমস্ত দিন, সমস্ত রাত
পাপীর স্পর্ধা, কাপুরুষের
চোখ-রাঙানি !

সমস্ত দিন, সমস্ত রাত
ঘুমুতে না পারার লজ্জা,
করুণাহীন…

রাস্তায় যে হেঁটে যায়

রাস্তায় যে হেঁটে যায়
জানে কি সে, কার এই রাস্তা? এ শহর
কার? এই দেশ…
নাকি ভাবে সবার! এ রাজপথ
রাজার এবং ভিক্ষুকের। এই দেশ
ইন্দিরার, এবং যে জেলখানায় রাত কাটায়, তার…

চোপ রও, উল্লুকের বাচ্চা! বাঁচতে চাও,
এই রাস্তা ছেড়ে হাঁটো! বাঁচতে চাও,
ভুলে যাও এই শহরের নাম! এই দেশ
ফুটপাতে শুয়ে থাকা উলঙ্গের;
কিন্তু যে উলঙ্গ আকাশের দিকে মাথা রেখে জেগে থাকে, তার নয়।

মাতলামো

'I do not provoke, I am drunk.'

উত্তেজনা ছড়াই না। কেননা এ মৃতবৎসা দেশে
আগুনের ফুল্‌কিগুলি শ্মশানের বাহবা বাড়ায়।
দূর থেকে শোনা যায় শৃগালের হাসি আর হায়নার গর্জন;
যত রাত দীর্ঘ হয় ততই বাঘের চোখ ভৌতিক আলোর মত, পাড়ায় পাড়ায়

ছড়ায় আতঙ্ক ! ক্রমে উলঙ্গের দীর্ঘশ্বাস, 'হা ভাত, হা ভাত' শব্দ ক্ষীণ হ'য়ে
বাতাসে মিলায়…

উত্তেজনা ছড়াই না। বরং এ শ্মশানের শান্তি থেকে পরিত্রাণ কী আছে,
কোথায়,
খুঁজি উন্মাদের মত ; ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি দু'হাতে সরাতে চাই ;
কিন্তু আমার দুই হাত ভর্তি ভিক্ষার বিস্বাদ অন্ন—
আমি কাকে পথ দেখাবো ? কোন্ পথ ? 'স্বাধীনতা, হায় স্বাধীনতা—'
বুক যত তোলপাড়, ততই ভিতরে রক্ত জল হ'য়ে যায় !

মৃত্যুর ধোঁয়ায় ঝাপসা চোখে সব অন্ধকার। শুধু স্বর্গ মনে হয়
গেলাস গেলাস মদ, মানুষ নামের জন্তু যেখানে স্বাধীন, গায়
মাতলামোর গান
'কে কার তোয়াক্কা রাখে'…আমি সেই মাতালের কোমর জড়িয়ে হৈ হৈ
জীবনের স্বপ্ন দেখি, হয়তো কিছু বেসামাল কথা বলি : 'এ নরকে
ঈশ্বরের বাচ্চা আর নেড়ীকুত্তা সমান সমান—
কে কাকে রাঙায় চোখ !'

উত্তেজনা ছড়াই না। শুধু, মাথার ভিতরে মদ গাঢ় হ'লে
যে কোনো উলঙ্গ মানুষের কাঁধে মাথা রেখে, গভীর ঘুমাতে চাই ;
ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখি, বাঘ-শিকারের স্বপ্ন, তখন আমার হাতে
অব্যর্থ নিশানা।
আবার কখনো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে চিৎকার করি : 'এই সংবিধান ঝুঠা !
স্বাধীনতা ? কার স্বাধীনতা ?'

সমস্ত শরীর মদে ভিজে গেলে, পাঁড়মাতাল, আকাশের দিকে আমি
উল্টো ক'রে ছুঁড়ে দিই এক ডজন কাঁচের গেলাস…

ফুটপাতে উলঙ্গ মানুষের গান

যে শীতে পালায় বাঘ
তার চেয়ে ঢের
নিষ্ঠুর শিকারী রাত
বধ ক'রে গেছে আমাদের !

আমরা মানুষ নই,
আমরা পশু-ও নই ;
আমরা শুধুই খাদ্য
কুয়াশার কুকুর কাকের…

আদিম অরণ্যের গানগুলি

[আফ্রিকার লোকগাথা]

১

বাপ মরেছেন
আমাকে কেউ জানায়নি তো !
মা মরেছেন
আমাকে কেউ শোনায়নি তো !
আমার বুকের ভেতরটা মোচড়ায়,
কেবল চেঁচায় :
হায়
হায় হায়
হায় হায় হায় হায় !

২

শিব্‌অ হে ! তোমার মনটা আমাকে দাও ;
তোমার ভাঁড়ার সকল সময় ভর্তি হে !

আমার মনটা নিয়ে নাও হে ;
কুঁকড়ে যাওয়া, উপোস করা, হাঁ-করা মন।
তুমি নিলে, দুদিন খেয়ে বাঁচি, আমি খিদের জ্বালায় ধুঁকছি, ভোলানাথ !

পেটটি তোমার নাদুস-নুদুস, একটুও নয় ছোট,
কিন্তু আমি খিদের জ্বালায় করছি ছটফট !

শিব্অ হে ! তোমার পেটটা আমাকে দাও ;
খেয়ে-দেয়ে দিব্য মেজাজ ! আর, আমি যে খেতে পাইনা,
আমার পেটটা নিয়ে নাও হে ; বুঝবে তখন খিদের কত জ্বালা !
ও ভোলানাথ ! আমার ডানহাত তুমি নিয়ে তোমার হাতটা আমাকে দাও !
আমার হাতে শিকার মরে না—কেবলই ফস্কায় !

৩

ছোকরা চাঁদ
হেই ! জোয়ান চাঁদ
হেই, হেই
জোয়ান চাঁদ, আমাকে খবর শোনাও
হেই, হেই

যখন সূর্য ওঠে, তোমাকে সেই খবরটা বলতেই হবে
কী ক'রে আমি কিছু খেতে পাই
এই ছোট খবরটা আমার কানে কানে তোমাকে বলতেই হবে
যাতে আমি কিছু খেতে পাই
হেই, হেই
জোয়ান চাঁদ !

৪

চলো হে, লড়াইয়ের দিকে যাই—

বদ্লা নেওয়ার এখানেই শেষ !

কার কাছ থেকে শুনলে হে
বদলা নেওয়ার এখানেই শেষ ?

ওহে, কার কাছ থেকে শুনেছ ঐ তাজ্জব কথা
বদ্‌লা নেওয়ার এত সহজেই শেষ ?

অথ মন্ত্রী কথা

১

রাজভবনে মন্ত্রী গজায়
খবর পেয়ে ব্যাঙের ছাতা
চিঠি লিখেছে আড়াই পাতা,
সে-ও একটি রাজত্ব চায়।

২

আয় বৃষ্টি হেনে   মন্ত্রী দেবো কিনে
বাজার থেকে সস্তা,   এক পয়সায় দশটা

'ক'টা মন্ত্রী কিনলি বাছা ?'
'তিনটে পাকা, সাতটা কাঁচা।'
মন্ত্রী পড়ে টুপ্‌টাপ্‌
সোনা গেলে গুপ্‌গাপ্‌···

৩

হ্যাদে লা ব্যাঙের ছাতা
এতকাল ছিলি কোথা ?
ছিলেম ভাই রাজভবনে ;
দাদা আমার মন্ত্রী হ'লো।
আমারে যেতে হ'লো।
দাদা নেন বংশী হাতে

আমি নিই কলসী কাঁখে ;
গিয়েছি খিড়কী দিয়ে।

ছেলেটা দিচ্ছে ডুয়ো
মেয়েটা তুরুক কাটে !

৪

নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো ম'রে রয়েছে,
মন্ত্রী হবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে···

ডিসেম্বর, ১৯৬৭

বাহবা সময়, তোর সার্কাসের খেলা

আশ্চর্য সময় আসে কুঁজো উল্লুকের পিঠে চড় কষিয়ে ; প্রাজ্ঞ চামচিকে
বিস্ফারিত তামাশার বাহবায় মুহুর্মুহু বোবা হ'য়ে যায় ;
নৈঃশব্দ উলঙ্গ হ'য়ে ধেই ধেই নৃত্য করে···ক্রমে রাত হ'য়ে আসে ফিকে
মহান নেতারা ঘরে ফিরে যান···নিহত কবির শব পচতে পচতে বক্তৃতার
মত হয় দেশপ্রেম-বিতরণী বেতারে, সভায় :

এ কাহিনী দেখে যারা, ফোকলা দাঁতে ফিক্ ফিক্ হাসে, আর শোনে যারা
দুর্দিনে তারাই থাকে টিকে !

কবি চান সোনার মেডেল

যা প্রতিবাদ যা প্রতিরোধ
তাদের সঙ্গে তোমার বিরোধ
কী ভঙ্গীতে ? কে নিভৃতে
শিখিয়েছে তোমায় মিতে
এমন ক্লৈব্য, এমন দৈন্য ;

যখন স্বদেশ অচৈতন্য
নরখাদক বাঘের থাবায় ?
যখন নিত্য নরকে যায়
নবজাতক, তার জননী ;
তখন কোন্ ঐশ্বর্যে ধনী
'শান্তি, শান্তি' মন্ত্র পড়ো
মুখের রক্ত সাদা করো ?
প্রলেপ মাখা মুখের শোভা
কে শেখালো এই বাহবা !
যখন চতুর্দিকে আগুন
এই পথে খুন, ঐ পথে খুন ;
হন্‌হনিয়ে তোমার গাড়ী
চলছে তখন রাজার বাড়ি !

জ্বলুক সহস্র চিতা অহোরাত্র এ পাড়ায়, ও পাড়ায়

'...They say that to meet a funeral is lucky.'
—Gogol : Dead Souls.

তাহ'লে কী জন্য আর একটি দুটি উলঙ্গের অনাহার মৃত্যুতে বিলাপ ? এক হাজার
একলক্ষ, দশ লক্ষ, দশ কোটি মানুষের মৃতদেহ কেন নয় ; বল হে সুবল সখা !
মৃতেই সৌভাগ্য যদি, যাক জাহান্নমে যত হাঘরে হাভাতে পড়শী ;
জ্বলুক সহস্র চিতা অহোরাত্র ও পাড়ায়, এ পাড়ায় ।
সখা হে ! ক'রো না শোক দুর্ভিক্ষের দেশে ! আমরা মৃত মানুষের আত্মা
কিলো প্রতি দশ টাকায় বিক্রী ক'রে লুটবো মুনাফা । হোক আগাছায়,
মৃত মানুষের মাথার খুলিতে, পরিত্যক্ত অস্থি-র পাহাড়ে শ্মশানের মত এই দেশ :

আমাদের ভবিষ্যৎ শ্রীরাধার মুখের মতই স্বর্গসুখের উদ্যান, পরকীয়া প্রেমে,
নপুংসক উলঙ্গের নিধনে ; শোনো হে সুবল সখা !
ধর্ম তাই । লক্ষ্মী বাঁধা আমাদের শ্রমে,
যুদ্ধে পরাঙ্মুখ বঞ্চিতের সর্বস্ব-লুণ্ঠনে ।

যৌবরাজ্যের বাসিন্দা

সে ছুঁড়ে দিয়েছে তার ভিক্ষাপাত্র—মাথার মুকুট।
কিছুই চাই না তার সমস্ত পৃথিবী ছাড়া
তাই ঘরছাড়া
খোঁজে সে স্বদেশ রাজপথে, এঁদো গলিতে, ভিক্ষার মিছিলে,
ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষের জিজ্ঞাসায় ;
খোঁজে বস্তীর অতল অন্ধকারে, কারখানার রক্তে আর ঘামে, ভূমিহীন
কৃষকের বঞ্চনায় কালো-মেঘ আকাশে ;
খোঁজে কিশোর ছাত্রের চোখে সমুদ্রের ঝড়, কিশোরীর সাদা হাতে
অমানিশার উদ্যত খড়্গ—
খোঁজে সে স্বদেশ লক্ষ লক্ষ বেকারের সূর্য-করোটিতে ; উলঙ্গের মাথার উপর
আগুনের প্রচণ্ড স্পর্ধায় ! খোঁজে
জননীর উপবাসে, শিশুর কান্নায়, তার মনুষ্যত্ব—বেঁচে থাকার গভীর অর্থ !

সে ছুঁড়ে দিয়েছে তার ভিক্ষাপাত্র—মাথার মুকুট।
তার চোখের সামনে অন্য ভোরবেলা : ইতিহাস : মানুষের মুখ—
কথা বলে স্পার্টাকাস, নেচে ওঠে ম্যাগ্‌নাকার্টা, গান গায় ফরাসী বিপ্লব ;
তার রক্তে বাজে নভেম্বরের দশ দিন, চীন কিউবা ভিয়েতনাম—
হাজার লেলিন—কোটি মানুষের তিন-ভুবন !
যৌবন
দশদিক থেকে তাকে ডাকছে ; তার অসহায় জন্মভূমি কেঁপে উঠছে প্রত্যাশায় !
তুচ্ছ তাই রাজার রাজত্ব—তাকে হাতছানি দেয় কোটি মানুষের আলিঙ্গন,
তার লাল নিশান…

নীরেন, তোমার ন্যাংটো রাজা

নীরেন ! তোমার ন্যাংটো রাজা
পোশাক ছেড়ে পোশাক পরেছে !
নাকি, তোমার রাজাই বদলেছে ?

সেই শিশুটি কোথায় গেল
যেই শিশুটি সেদিন ছিল ?
নীরেন, তুমি বলতে পারো,
কোথায় গেল সে ?
নাকি, তুমি বলবে না আর ;
তোমার যে আজ মাইনে বেড়েছে !

হেইও হো ! হেইও হো !
পোশাক ছাড়া নীরেন, তুমি,
তুমিও ন্যাংটো !
কিন্তু ঘরে তেমন একটি
আয়না রাখে কে ?
এই রাজা না, ঐ রাজা না।
তুমিও না ; আমিও না।

হেইও হো ! হেইও হো
পোশাক ছাড়া নীরেন, আমরা
সবাই যে ন্যাংটো !
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে !

কিন্তু তুমি বুঝবে কি আর ;
তোমার যে ভাই, মাইনে বেড়েচে !

ভেতরে মানুষ নেই

'সাবধান ! কুকুর আছে !' দরজায়
রয়েছে কুকুর,
নেই শুধু ভেতরে মানুষ…

তাই সাবধান !

বক্তৃতা বাবু

হেই বক্তৃতা বাবু! তুই হুই শহরের সাততলা বাড়ি থেকে
নামলি মাচায়, এলি গাড়ী চড়ে মিটিং করতে
আমাদের শরীরের কালো রঙ সাবান মাখিয়ে ফর্সা ক'রতে, আমাদের
ছেলেমেয়েদের ভালো, সভ্য ক'রতে ;
এলি যেন লাটসাহেবের নাতি ! বক্তৃতা দিয়ে যাবিও সেখানে—
কল টিপলেই জল পড়ে। ঘর আলো হয় ঘুটঘুটে কালো রাতে ;
আবার বিজলি পাখাও ঘোরে—বক্তৃতা দিয়ে শরীরে যদিই ঘাম
লাগে তোর, বক্তৃতা বাবু !

তুই বড় ভালো ছেলে। আমাদের জন্য কত যে খাটিস-পিটিস্ !
কেবল ঘরের বিজলী পাখাটা বন্ধ হ'লেই মেজাজ গরম ;
জলকে বরফ করার যন্ত্র—সেটাও বিকল !
তুই না রাজার বেটা ! রেশনের চাল ছেড়ে দিয়ে খাস বাসমতী চাল—
তবু আমাদের জন্য রাত্রে ঘুমাস না তুই ; আহা রে, সোনার বাবু !

পিতা-পুত্র

আমার পিতা ওড়াতেন যৌবনে
বাড়ির ছাতে 'ইউনিয়ন জ্যাক'।
বয়েসে তাঁর বেড়েছে অভিজ্ঞতা ;
এখন ওড়ান আরেক পতাকা।

পিতার আমার ভয় ছিল যৌবনে
স্বাধীন দেশে থাকবে না তাঁর খেতাব।
এখন তিনি ভীষণ সাহসী ;
খেতাব আছে, বেড়েছে কালো টাকা।

আমার পিতা গাইতেন যৌবনে
'দিল্লীশ্বরী, জগদীশ্বরী বা।'
এখনো তাঁর কণ্ঠে এক গান ;

আমারই শুধু বেঁচেবর্তে থাকা।

ভিক্ষার মিছিল যায়

ভিক্ষার মিছিল যায় ;
নরখাদক বাঘের সিংহদরোজায়
পাঠায় স্মারকপত্র, চায়
নিরাপত্তা—একটি ছুটি স্বপ্ন-দেখা জীবনের বিনিময়ে
ক্রীতদাস পশুদের উলঙ্গ অভুক্ত বেঁচে থাকার অস্তিত্ব।

জীবন
এখনো আশ্চর্য রূপকথা, এই বিংশ শতাব্দীতে ;
দেখি তাই…

অথ নীলবর্ণ শৃগাল কথা

চল্লিশে হ'য়েছিল অনেক প্রগতি
আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ;
আমরা ছিলাম সৎ, আমাদের মহিলারা সতী।

সুতরাং সত্বরে 'ধিন্ তা, তা ধিন্ তা'—
যে ম্যাজিক দেখাবো হে, খুবই কঠিন তা।
চল্লিশে হ'য়েছিল অনেক প্রগতি
দেশজুড়ে আজ শুধু ছিনতাই !
হুর্‌রে, আমরা সৎ, আমাদের মহিলারা সতী।

মোর্চার সাঙাতেরা 'তেরে কেটে, তেরে কেটে'—
এর মুণ্ডুটা ওর ধড় থেকে নিলে কেটে,
যে ম্যাজিক দেখাবো হে, খুবই কঠিন তা—
জাগাবো গৃহস্থকে ; চোরকে বলবো, নেই চিন্তা !
চল্লিশে হয়েছিল অনেক প্রগতি
সত্তরে 'ধিন্ তা, তা ধিন্ তা',—
আমি সৎ, আমাদের চৌদ্দপুরুষ সৎ, আমাদের শ্রীমতীরা সতী।'

আর এক মহিষাসুর

অসুর রে।   তুই যাত্রাদলে যেই লেখালি নাম,
হলি মহিষাসুর, সে কী তিড়িং নাচ তখন তোর ;
বাপ্ রে, সে কী ভয়-দেখানো সার্কাসের খেলা।

যতই বাড়ে বেলা, ততই মেজাজ তোর চড়া, যেন
এর মুণ্ড খসাবি, ওর চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবি !
আমরা ভাবি কোথায় পালাই, এমনি তোর হুলুস্থুল কাণ্ডকারখানা !
তোকে করবে মানা, কারুর নেই এমন বুকের পাটা—
তুই যে বাপের ব্যাটা !   পরের হাড় কড়মড় ক'রে খাওয়াই
ধর্ম তোর, সেই তোর ছৌ-নাচ !

সূর্য অস্ত গেলে বুঝি এবার শান্তি—কিন্তু তুই যে স্বয়ং অশান্তি ;
হুঙ্কারে তোর গাছগুলিও পাথর, কোলের শিশু কান্না ভুলে
কঠিন কাঁপতে থাকে—
গাঁয়ের মানুষ যে যার ঘরে দরজা দিয়ে সমস্ত রাত জেগে কাটায় !

যতক্ষণ না ফুরায় তোর স্পর্ধা, তোর সার্কাস, তোর মুখোস নাচের বাহাদুরী—
যতক্ষণ না পাড়ার থুথ্‌ড়ে বুড়ি তোর দু'গালে চড় ক'ষিয়ে
বলে তোকে, 'হারামজাদা !   এবার ঘুমুতে যা !'

আফ্রিকা

(নিহত প্যাট্রিস লুমুম্বাকে মনে রেখে)

রক্তাক্ত শিশুর দেহ লুফে নেবে রাক্ষসী গ্রহণ
নিষ্পাপ পিতার কণ্ঠে স্তব্ধ হবে বীভৎস গোঙানি
যে মাটিতে কান পাতবো, শুনবো নরকের কানাকানি
পশুর থাবায় নষ্ট প্রেম হাঁটবে প্রেতের মতন
আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডে ; ভ্রষ্ট চাঁদ-সূর্যের বমন
ত্রিভুবন বিষ করবে, কেঁদে উঠবে বেশ্যা ও জননী !

সব ছবি মনে আছে ; পূতিগন্ধময় বেইমানী !
ঘৃণায় সর্বাঙ্গ পাপ, স্মৃতি পাপ, জীবনধারণ
ভয়ঙ্কর অপরাধ ! জায়া পুত্র জন্মভূমি পণ—
চোখে ভাসছে পাশাখেলা, গৃহযুদ্ধ ; একফোঁটা আমানি
কোথাও ক্ষুধার জন্য থাকবে না।...সব দৃশ্য জানি ;
ভ্রাতৃহন্তা দানবেরা উপড়ে নেবে তৃতীয় নয়ন !

আফ্রিকা ! সমস্ত জেনে তোমার প্রলয় বুকে টানি—
মৃত্যু পরিত্যক্ত ক্রোধ, মৃত্যু আজ মন্ত্র উচ্চারণ !

যাদের সঙ্গে তুমি পার্টি করো, কখনো কি করেছ জিজ্ঞাসা...

(গোলাম কুদ্দুস, কবি-কে)

গোলাম কুদ্দুস ! তুমি লিখেছিলে 'ইলা মিত্র'—বিখ্যাত কবিতা,
প্রতিবাদ করেছিলে তোমার যৌবনকালে নারীর চরম অসম্মানে !
অগ্নিশুদ্ধ কবি তুমি, এখনও অটল ধর্মে। যদিও লেখ না আজ
রাত জেগে কবিতা—
স্রষ্টা তুমি ! দেখ না কি আবার দশদিক অমা বিস্ফারিত ধরিত্রীর রক্তের বমনে ?

গাণ্ডীব দিয়েছ ছুঁড়ে ? কিন্তু তুমি সাংবাদিক, লেখ তো কাগজে
প্রত্যহের রোজনাম্‌চা। তোমার কলমে তবে কী-জন্য জ্বলেনা আজ তুষের আগুন ?
যখন স্বপ্নেও রোজ হানা দেয় হাটে, মাঠে, অন্তঃপুরে, প্রকাশ্য রাস্তায়
ভাড়াটে জল্লাদ—করে নির্বিচারে শিশু, যুবা, এমন কি সীমন্তিনী কল্যাণী-কে খুন !

কবিতা লেখ না তুমি, কিন্তু যারা আজও লেখে 'জামায় রক্তের দাগ'
গঙ্গাজলে ধুয়ে—
নারায়ণী সেনা তারা, তোমার মতই দীপ্ত, স্বধর্মে অটল ছিল
চল্লিশের প্রচণ্ড দুপুরে !
তাদের সঙ্গেই তুমি পার্টি করো ; কখনো কি নিভৃতেও করেছ জিজ্ঞাসা :
'ছেলে গেছে বনে' যার, সেও কেন কৈকেয়ীর অধর্মে দিয়েছে তার রাজমুকুট ছুঁড়ে ?

কমরেড কুদ্দুস ! তুমি দেবে কি এ গোলমেলে ধাঁধার উত্তর ?
তুমি কবি, একদিন লাঞ্ছিতা নারীর বেণী-না-বাঁধার প্রতিজ্ঞাকে জানিয়েছ
অমল প্রণাম।
আজ সেই মহীয়সী মহিলাও হেঁটমুণ্ডে দুঃশাসনের জন্য ভোট কুড়ান
দরজায়, দরজায় !…
তোমার অনেক আগে এই দেশে বোবা হয়ে গিয়েছেন নজরুল ইসলাম !

৩ মার্চ, ১৯৭২

হাসে দ্বারকার পথে ঘাটে ভাড়াটে জল্লাদ

জীবন কেমন স্থির হ'য়ে গেছে নতজানু ক্রীতদাসদের
সান্ধ্যসঙ্গীতের অবাক সভায় !

মাঝে মধ্যে কোলাহল ভেসে আসে, গুলিবিদ্ধ শার্দুলের মাংস ছিঁড়ে নিতে
সারমেয়গণ দ্রুত ছুটে যায় ;
তাদের অশ্লীল বাহবায় কাঁপে ভুবনমোহিনী রাত্রি,
ম্লান হ'য়ে যায় জ্যোৎস্নার নক্ষত্র,
বিতৃষ্ণায় মাথা নাড়ে দীর্ঘ তরুবীথি—

আহা, জীবন ! আবাদ করলে হ'তো সোনা সেই মানব জীবন
আজ এমনি ইতর রসিকতা !
হাসে দ্বারকার পথেঘাটে ভাড়াটে জল্লাদ, জননীর পরিত্যক্ত
নবজাত শিশুর কান্নায়...

১৯৭২

ভয়ের গল্প এবার থামা

ভয়ের কথা বলিস নে আর
চোখ রাঙিয়ে বলিস নে আ'র
মুখ বাঁকিয়ে বলিস নে আর...

শুনতে শুনতে, ভয়ের কথা শুনতে শুনতে
কখন দেখি হাই তুলে এক ছোট্ট শিশু
বলছে : 'আরেক গল্প বলো ; আরেক গঃ

ভয়ের গল্প একেবারে বাজে ।'

২৬ জানুয়ারী, ১৯৭৪

১

জীবন-বীমা অফিসে লক আউট
এয়ারলাইনে লক আউট
চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট
চিকিৎসকদের ধর্মঘট
চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট, ঘেরাও, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ
অধ্যাপকদের মিছিল, প্রতিবাদ, চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থান
শিক্ষকদের মিছিল, প্রতিবাদ
গুজরাটে ক্ষুধার্তের মিছিল, পুলিশের গুলিতে তিরিশ জন নিহত

মহারাষ্ট্রে ক্ষুধার্তের মিছিল
মন্ত্রিসভার পদত্যাগ-দাবিতে কলকাতায় ছাত্র পরিষদের মিছিল
এসব ঘটনার মানে কী ? তাৎপর্য কী ?
মাননীয় রাজ্যপাল ডায়াস
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়
মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী, মাননীয় আইনমন্ত্রী !
আপনারা কি এখনো চোখ-কান খোলা রেখেছেন ?
অনুভব করছেন, সময় কোথায়, কীভাবে পাগলা ঘণ্টা বাজাচ্ছে !

২

সর্ষের তেল বারো টাকা থেকে কুড়ি টাকা কিলো
চিনি উধাও
লবণে বিষ, চালে আগুন
কয়লায় আগুন, কেরোসিনে আগুন
অধ্যাপকরা পাঁচ মাস মাইনে পান না
শিক্ষকেরা মাইনে পান না
কয়লাখনির মজুরেরা
চটকলের মজুরেরা
চা-বাগানের মজুরেরা
কেউ অর্ধাহারে, কেউ অনাহারে···
অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ এখন আর কোনো সংবাদই নয়।
চাষীরা মহাজনদের কাছ থেকে অক্টোবরে চার টাকা কিলোয় চাল কিনেছে ;
মহাজনেরা এক কিলো চালের দাদন নিচ্ছেন এখন চার কিলো
দশ কিলোর জায়গায় চল্লিশ কিলো···
পঁচিশ কিলোর জায়গায় একশো কিলো···
এসবও কোনো সংবাদ নয়।
চাষীরা জানে, তিন মাস পরে তাদের অনাহারে মরতে হবে
বেকারেরা জানে, রাজনীতি করুক আর নাই করুক,
পুলিশ তাদের খুঁজে বের করবে

শ্রমিকেরা জানে ছাঁটাই আর লক আউটের যাঁতাকলে তাদের
পিষে মারা হবে
শিক্ষকেরা জানে…

সমস্ত দেশ এখন বানের জলে ভাসছে
হু হু করে বেড়ে চলেছে গ্রাজুয়েট, এম. এ. পাশ, ইঞ্জিনীয়ার,
ডাক্তার বেকারদের সংখ্যা
বেড়েই চলেছে পুলিশের গুলী-খাওয়া মানুষের সংখ্যা
বাড়ছে মহাজনের ঘরে ভাগচাষীর দেনা, যা এখনই আকাশ স্পর্শ করছে
বাড়ছে ভেজাল যা বাপকেও রেহাই দেয় না
বাড়ছে কালোবাজার, তিমি মাছের চেয়েও প্রকাণ্ড যার হাঁ !
শুরু হয়ে গেছে সমস্ত ভারতবর্ষে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল
আদিবাসী উলঙ্গ মানুষদের কান্না এখন দশহাত ধুতি-পরা মানুষগুলিকেও
চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে !
গাঙ্গেয় সমতলের পলিমাটি এখন পাথরের মত রুক্ষ, সেখানে ফসল ফলে না
যা মাঠে ফলে তাও ঘরে আসে না,
রাতারাতি উধাও হয়ে যায়—কোথায় যায়—তার উত্তর মেলে না !
উত্তর মেলে না বলেই একসময় কান্না-গোঙানির শব্দগুলি স্তব্ধ হয়ে আসে ;
তারপর শোনা যায় সমুদ্রের গর্জন।
পুলিশের সাধ্য কী
মিলিটারীর সাধ্য কী
দিল্লীর ঈশ্বরীর ভাড়াটে জল্লাদদের সাধ্য কী
এই কান্নার মিছিল, এই মিছিলের গর্জনকে গলা টিপে হত্যা করে !
তোমরা আমাদের চোখ দুটি উপড়ে নিতে চাও, উপড়ে নাও !
আমাদের জিভ ছিঁড়ে নিতে চাও, আমাদের ধড় থেকে
মুণ্ডুগুলি খসিয়ে দিতে চাও
আমাদের ন্যাংটো করে শেয়াল-শকুনদের সামনে ছুঁড়ে দিতে চাও—
তাই হোক। মানুষ আর এখন মৃত্যুকে পরোয়া করে না
দেখছো না ! সমুদ্রের লোনা পানিকে ছাড়িয়ে গেছে উলঙ্গ মানুষের
কান্না আর আর্তনাদ

সমুদ্রের তুফান, গর্জনকে ছাড়িয়ে গেছে আসমুদ্রহিমাচল বঞ্চিত মানুষের
চাপা গর্জন।
ক্রমাগত ব্যভিচার ক'রে ক'রে দুষিত পাপের রক্ত শরীরে নিতে নিতে
তোমরা এখন অন্ধ, তাই দেখছো না···

৩

পশ্চিমবঙ্গের সুবেদার মাননীয় রাজ্যপাল!
এই রাজ্যের সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী!
শুনতে পাই আপনারা সকল কিছুর উর্ধ্বে;
মানুষের ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য আপনাদের কিছুই স্পর্শ করে না···
আপনারা এই সময়ে কিছু কথা বলুন!
আমরা এখনই আপনাদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা চাই।
আপনারা বলুন,
এইভাবে রাজ্যপাট শাসন আর শোষণ
আর কতদিন চলবে?

আপনার কি শুনতে পাচ্ছেন, ঘণ্টা বাজছে, দূরে, কাছে,
একসঙ্গে অনেকগুলো
পাগলা ঘণ্টা?
যা শুনে জেলখানার খুনী আসামীদেরও বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে!
সেই ঘণ্টা বাজছে, দূরে, তারপর কাছে, তারপর একেবারে কাছে, তারপর···

সেই মানুষটি, যে ফসল ফলিয়েছিল / আন্তোনিও জাসিনটো

সেই বিরাট খামারটিতে কোন বৃষ্টি হয় না
আমার কপালের ঘাম দিয়ে গাছগুলিকে তৃষ্ণা মেটাতে হয়।

সেখানে যে কফি ফলে আর চেরী গাছে যে টুকটুকে লাল রঙের বাহার ধরে
তা আমারই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, যা জমে কঠিন হয়েছে।
কফিগুলিকে ভাজা হবে, রোদে শুকোতে হবে, তারপর গুঁড়ো করতে হবে
যতক্ষণ না তাদের গায়ের রঙ হবে আফ্রিকার কুলির গায়ের রঙে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!

আফ্রিকার কুলির জমাট রক্তে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ !

যে পাখিরা গান গায়, তাদের জিজ্ঞাসা করো,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, তাদের :
এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে যে বাতাস মর্মরিত হচ্ছে, তাদের :
কে ভোর না হতেই ওঠে ? কে তখন থেকেই খেটে মরে ?
কে লাঙল কাঁধে দীর্ঘ রাস্তা কুঁজো হয়ে হাঁটে, আর কেইবা
শস্তের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয় ?

কে বীজ বপন করে আর তার বিনিময়ে যা পায় তা হলো
ঘৃণা, বাসি রুটি, পচা মাছের টুকরো,
শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক, কয়েকটা নয়া পয়সা ? আর এর পরেও
কাকে পুরস্কৃত করা হয় চাবুক আর বুটের ঠোক্কর দিয়ে ?
—কে সেই মানুষ ?

কে ক্ষেতগুলিতে গম আর ভুট্টা ফলায়, আর সারি বাঁধা
কমলা গাছগুলিতে ফুলের উৎসব আনে ?
—কে সেই মানুষ ?
কে ওপরওলাকে গাড়ী, যন্ত্রপাতি, মেয়েমানুষ কেনার টাকা
আর মোটরের নিচে চাপা পড়ার জন্য নিগ্রোদের মুণ্ডুগুলি যোগান দেয় ?

কে সাদা আদমীকে বড়লোক তৈরী করে,
তাকে রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলে, পকেটের টাকা যোগায় ?
—কে সেই মানুষ ?

তাদের জিজ্ঞাসা করো ! যে পাখিরা গান গায়,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে,
যে বাতাস এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে মর্মরিত হয়,
তারা সকলেই উত্তর দেবে :
—ঐ কালো রঙের মানুষটা, যে দিনরাত গাধার খাটুনি খাটছে !

আহা ! আমাকে অন্তত ঐ তালগাছটার চূড়ায় উঠতে দাও
সেখানে বসে আমি মদ খাবো, তালগাছ থেকে যে মদ চুঁইয়ে পড়ে ;
আর মাতলামোর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবো, ভুলে যাবো, ভুলে যাবো :

আমি একজন কালো রঙের মানুষ, আমার জন্যেই এই সব।

বন্ধ অট্টালিকা / ওলগা কির্চ

বিভীষিকার কালো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই দুর্গ,
দরজাগুলি একের পর এক বন্ধ করে দিয়েছে ঘৃণা।

যে বানিয়েছে এই প্রাসাদ, দেয়ালের ফোকরে—শক্তমুঠিতে—ধরে আছে
তার বন্দুকের নল ;

দেয়ালে কী লেখা আছে, তা দেখার জন্য এতটুকু মাথা-নাড়ানোর
সাহস নেই তার।

ক্রীতদাস

মার্ক্স না পড়েই মার্ক্সবাদে তাঁর ঘৃণা
লেখেন মনীষী বাজারে পত্রিকায়।
দাসের বাজারে এটাই ফ্যাসন কিনা ;
তা ছাড়া পকেটে পয়সাও পাওয়া যায়·

হত্যা

স্বর্ণশিল্পীদের মনে রেখে

একথা ঠিক, তাদের বুকে কেউ ছুরি বসিয়ে দেয় নি ;
এ কথা ঠিক, তাদের মুখে কেউ বিষ তুলে দেয় নি ;

তাদের খুন করা হয়েছে অত্যন্ত ভদ্রভাবে, সভায় হাত তুলে
স্বদেশের আর স্বাধীনতার নামে।

১৯৬৩

সিংহাসনে বসলো রাজা

বাইরে একটু বাতাস আসতো
গাছতলায় শান্ত হয়ে নামতো আলোর আশীর্বাদ
পথে বেরুলে পায়ের নীচে মাটি যদিও আগুন, তবু
পথ চলায় বাহবা ছিল, মিছিলে ফুলের মালা।

কবে যে হাতের লাল নিশান মাথার মুকুট হলো
দরজা জানলা বন্ধ একটা বিরাট ঘরে জ্বললো হাজার ক্যামেরা ;
'দেখো! সিংহাসনে বসলো রাজা।'

সারাদিনের ক্লান্তি শেষে গাছের ছায়ায় মাথা রাখার
দীঘির জলে পা ডুবিয়ে ব'সে থাকার, স্বপ্ন দেখার
দিনগুলি ম্লান মুখে বিদায় নিয়ে গেছে। এখন
দারুণ গ্রীষ্মে চামর দোলায় ভক্তেরা আর বাইরে হাঁটে ক্ষুধার মিছিল,
তার দেখতে বারণ।

জননী বলেন

ঐ রাস্তায় যাস্ নে, বাছা!
সাপ নয় ; কিন্তু তার চেয়ে বেশী। তুই অন্ধ,
দেখতে পাস না,

ঘুরছে পুলিশ!

এই নরকে

কবিরা কোথায় আজ ? উত্তরার জলসা ঘরে এখনো কি নাচ শেখায় তারা?
এদিকে যে শমীবৃক্ষে মন্ত্রপড়া অস্ত্রগুলি কীচকের বাড়ায় আহ্লাদ!

শুনি পাড়ায় পাড়ায় জল্লাদের আস্ফালন ; দেখি ঘরে ঘরে
নরখাদকের রক্তমাখা থাবা, পিশাচের মার…

কবিরা কোথায় আজ ? সবাই কি দুর্যোধনের কেনা,
নাকি বিরাট রাজার ক্রীতদাস !

নতুন প্রত্যয়

'Workers of the world, unite !'

—Communist Manifesto

আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়াটাই সব নয় ;
তাতে একজন মানুষের শরীর রক্তাক্ত হয়
কিন্তু যারা পেরেক দিয়ে ঐ শরীরকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে
তাদের কিছু আসে যায় না।

বরং এসব মহানুভবতা বঞ্চিত মানুষকে আরো নতজানু হ'তে শেখায়
আর যাদের এমনিতেই পোয়া বারো, তারা দু'পয়সা বেশী চাঁদা দিয়ে
গীর্জাগুলির শোভা-বৃদ্ধি করে
যাতে রক্ত দেওয়াটাকে মনে হয় গৌরবের মতো
আর কারখানা খনি খামার থেকে মন্দির ও বেশ্যালয় পর্যন্ত
মানুষের রক্ত ক্রমেই কালো হতে থাকে।

আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া নয়
ক্রুশটাকেই ভেঙে ফেলা দরকার।
সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই
কিন্তু অর্জন করার আছে—
পুরানো বস্তাপচা বিশ্বাসগুলির বিপরীত
কোনো নতুন প্রত্যয়, যা একদিন মানুষকে সত্যিকারের ধর্ম শেখাবে।

আর সে মানুষ নিশ্চয় পায়ে শিকল পরে
ঈশ্বরের নির্দেশ মানতে
একটি বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দিকে নিজের গলাটা বাড়িয়ে দেবে না।

আশ্চর্য মুহূর্ত আসে, চলে যায়

আসে যায় নভেম্বর আমাদের বাৎসরিক গীতা পাঠে, প্রত্যাশায়,
রক্তের কল্লোলে ;
পাণ্ডব শিবিরে জ্বলে লণ্ঠনের লাল আলো ; যেন রাত ভোর হবে তাই রাত
জেগে থাকবো ব'লে
আমাদের বুক-ভর্তি স্বপ্ন স্থির হ'তে চায়। তারপর শীতের কাঁথায় মুখ ঢেকে
আসে কুয়াশা, কুয়াশা শুধু ;
মনে হয়, গভীর রাত্রির চেয়ে অন্ধকার আমাদের নভেম্বরের দিনগুলি আর
ইতস্তত পলাতক পদচিহ্ন, বিনাযুদ্ধে শ্মশানের শান্তি—তার অবসাদ
সমস্ত জীবন।

তবু আশ্চর্য মুহূর্ত আসে ; আমাদের কুঁজো পিঠ খাড়া ক'রে সটান দাঁড়াতে
আনে সারথীর বার্তা—একটি মুহূর্ত—মনে হয় আমরা নই চিরকাল
লেজগুটানো নেড়ীকুত্তা, হাঘরে, হাভাতে…

এইখানে তোর জন্মভূমি শুয়ে আছে, প্রতীক্ষায়

এ কবন্ধ অন্ধকারে চারদিক যদি তোর মৃত্যুর পাহাড়
আর ভয়, তোর রক্ত হিম ক'রে নেমে আসবে এক লক্ষ সাঁজোয়া পুলিস ;
যেদিকে হাঁটবি তুই, গর্জাবে নরখাদক
আর কাঁটাতারে ঘেরা বন্দীয় শিবিরগুলি খুনে লাল,

কেউ নেই সামনে তোর। দেবতারা সবাই মুখোশ, অথবা খড়ের মূর্তি ;
এই নরকেও কেমন আশ্চর্য স্থির…

আর তুই ছায়ার মতন, মাটিতে মিশিয়ে বুক, শুনিস বুটের শব্দ
এ রাস্তায়, ও রাস্তায়! তবু রাস্তা, তোর মত হাজার হাজার উলঙ্গের
একটিই কান্নার রাস্তা—এই তোর ঘর—যেদিকে দু'চোখ যায় ;
তুই অনুভব কর, এইখানে তোর জন্মভূমি শুয়ে আছে রক্তের সমুদ্রে,
প্রতীক্ষায়…

তোর নিরাপত্তা

আমি তোকে ঠিক লুকিয়ে রাখবো
আমার শিরা-উপশিরার মধ্যে
সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়
যদি তুই শপথ নিয়ে থাকিস
একদিন আমারই দেওয়া
তোর মনুষ্যত্বকে
রক্ত-পতাকার মতো তুলে ধরবি
সেই সব ডাকিনী বিদ্যার মুখোমুখি
যারা বমন করে বীভৎস অমানুষিকতা
ষড়যন্ত্র আর মৃত্যু

আমার কাজ
এখন তোকে সন্তর্পণে লালন করা
আমার ধমনীর মধ্যে
যেখানে আমার রক্তের আগ্নেয়গিরিকে
আমি প্রাণপণ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি
সেই ভবিষ্যৎ দিনটির জন্য
যখন সময় আসবে
যখন পাহাড়ের মতো বিরাট
পাথরের অন্ধকারগুলিকে
ভাসিয়ে ছিঁড়ে তলিয়ে নিয়ে যাবে
এক অপরাজেয় মিছিলের
হাজার হাজার রক্ত-পতাকা
আর গড়ে উঠবে
তোর মতো মানুষদের মৃতদেহের ওপর
এক নতুন মনুষ্যত্ব
তার সভ্যতা

মিছিলে ২

১

সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে
মাত্র কয়েকটি পুরনো মুখ ;
আর যারা, একেবারেই কিশোর
আর যারা, জেলের অন্ধকারে বহুদিন হারিয়ে যাওয়া শিশুগুলির
কেউ মা, কেউ বোন…

২

বৃষ্টির পর আকাশ এখন
রৌদ্রের দিকে মাথা তুলেছে। তাদের কণ্ঠের ঐকতান
বিষাদ এবং প্রতিজ্ঞার একটিই অবগাহন।
তারা এখন সেই সব শব্দ আর ধ্বনিকে খুঁজছে
যারা আমাদের ধমনীর ভিতর প্রবাহিত রক্তকেও
গাঢ় এবং অর্থময় করে তুলতে পারে।
অথচ তাদের রক্তনিংড়ানো ভালবাসা থেকে
শব্দ আর ধ্বনিগুলি যখন জন্ম নিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে
ঊর্ধ্বে, আকাশের দিকে—
তারা বহু শৃঙ্খলিত মানুষের ধিক্কার, ঘৃণা, প্রতিবাদ আর দাবি ছাড়া কিছু না।
আবার অনেক কিছু ; কেন না মানুষের অভিজ্ঞতার শেষ নেই—
দিনের পর দিন রক্তের সমুদ্র সাঁতরিয়ে মানুষ জেনেছে,
ভালবাসার আরেক নাম ঘৃণা ;
রাতের পর রাত স্পর্ধার পাহাড়ে আছাড় খেতে খেতে সে জেনেছে,
ভালবাসার আরেক নাম প্রতিবাদ !

৩

কিছু আগে, আর একেবারে পিছন থেকে
কালো রঙের পুলিস-ভ্যান একটা বিরাট অজগরের মতো তাদের
ঘিরে রয়েছে।

তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন, কেন না, পুরনো বন্ধুরা
তাদের পরিত্যাগ করেছে। তবু তারা রাস্তায় নেমেছে। এক ভয়াবহ
পাশবিক শক্তির প্রহারে জর্জর
হাজার হাজার কিশোরের আর কিশোরীর রক্তে-ভাসা মুখগুলি মনে রেখে।

একটি অসমাপ্ত কবিতা

'The breath of his life
He has taught to be language,
The spirit of thought'.—Sophocles

জীবনের নিঃশ্বাস যে ভাষা
আমাদের চৈতন্যকে করে যে বাঙ্ময়, অবচেতনাকে জ্যোতির্ময় ;
আমাদের বুকের ভিতরে রক্ত-চলাচল স্পন্দিত করে যে মন্ত্রে,
মানবিক প্রত্যয়ে, শপথে ;
আত্মাকে যে শুদ্ধ করে তেজে, করুণায় করে নমনীয়, প্রেমে অপরূপ।

স্বাধীন, স্বচ্ছ মুক্তধারা !

যদি শৃঙ্খলিত হয় ! যদি বিস্ফোরিত হয় হৃৎপিণ্ডের রক্ত-নদী ! যদি…

জলে ভাসে মাঘব্রত

'And the crows swim in a well of blood'.

১

শীতের মতই রক্ত মিশে আছে কবিতায়
মৃত্যুর মতই রক্ত মিশে আছে কবিতায়।
শীত যা হলুদ পাতা যা মাটির নীচে ঠাণ্ডা শবাধার

মৃত্যু যা বিবর্ণ ঘাস, রাস্তার দু'পাশে পড়ে থাকা হিম সাপের খোলস ;
কবিতা যা অনির্বচনীয় শাস্তি, শাস্তি শুধু, আর চাপ চাপ রক্ত…

২

মাঘ মাসের চাঁদ ছিঁড়ে, নদী ছিঁড়ে, রাত্রির গর্ভের যন্ত্রণায় স্থির শুয়ে থাকা
সবিতার ব্রত ছিঁড়ে
পাপড়িগুলি দে ছড়িয়ে বাতাসে, মেহের আলি ! খেলা দেখবি, বাতাসে
রক্তের খেলা।
সেই রক্ত পান ক'রে শীত তাড়াবে তীর্থের ভূশণ্ডী কাক,
সেই রক্তে স্নান ক'রে মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখাবে খড়ের কাকতাড়ুয়া, যে
কমণ্ডুলে শান্তিবারি নিয়ে ঘোরে, যেদিকে যখন হাওয়া ছিঁড়ে ফেলতে
চায় ঘুম।

৩

কান্নায় যে ভেঙে পড়ে, কী আছে অস্তিত্ব তার ?
তার জন্মভূমি আজ অন্য এক সমারোহ, চারদিকে কুকুরের ঘাম আর
জাহাজ-ভর্তি পণ্য—পচা গম, পোশাকী আতর !
এক-পয়সায়-কেনা কবি শুধু রক্ত মোছে শুয়োরের দাঁতবসানো গাল থেকে,
আর ওড়ে এক হাজার লক্কা পায়রা,
আর হুঁশিয়ার করে সার্কাসের বুড়ো ভাঁড় : 'রাস্তা ছাড় ! রাস্তা ছাড় !
সম্রাজ্ঞীর হাত ধ'রে আসছেন দেবতা ব্রেজনেভ !'

যে জাগে, মাটিতে কান রেখে, মুঠোর মধ্যে রক্তমাখা শান্ত হলুদ ঘাসের ফুল ;
কুয়াশায় তাকে দেখা যায় না…

নভেম্বর, ১৯৭৩

ভিক্ষার রুটি

'...bread that increased the hunger.'

এ রুটি ছুঁসনে ! এই ভিক্ষার অবাক রুটি—যার ছায়ায় পৃথিবীর
খুন লেগে আছে।

এ রুটির হাওয়াতেও দাউ দাউ ক্ষুধার আগুন ! তোর
কঙ্কালীতলার মতো পেট
এমনিতেই জলে যাচ্ছে। তোর ঘর, তোর রাস্তা, তোর দেশ আজ
শ্মশানের শান্তি···

নিবন্ত চিতার ঘুম ভাঙিয়ে যে রাজা হয়, হবে। তুই এ রুটি অস্পৃশ্য জেনে
ছুঁড়ে দে ঊর্ধ্বের দেবতার নষ্ট করুণার দিকে। তুই আকাশের সম্রাটের কাছে
দাবি কর ; মানুষের শ্রম—
অন্ন, ঘামে ভেজা রুটি।

এই জন্ম

কোন্ জন্মান্তর ? এই কসাইখানার
ভৌতিক সংগীত ? রাজপথে
নৃত্যের মুখোসে জ্বলে রক্ত···কার রক্ত ?
এই জন্মে কে তুমি ? কোথায় যাও ? পথ
যতদূর দেখা যায় নদী, শীর্ণ, লোহিত···
নরক কোথায় ছিল এতকাল ? কেমন ঘুমন্ত
এই শহরে ! এখনো কবিতা লেখ ?
তুমি কেন লেখ ?
এ তো গান নয়, ছবি নয়
শুধু শ্মশান ! এ-জন্মভূমি কবে ছিল তোমার ?
তোমার জন্মের লগ্নে অহঙ্কার ছিল না ? শুধুই
ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী শিয়রে···চারদিকে শূন্য
প্রান্তর, নিঃশব্দ, মৃত···

তুমি জন্ম নিয়েছিলে অনন্ত কান্নার মধ্যে
অনন্ত রক্তের মধ্যে ;
তবু স্পর্ধা, কবিতা লিখতে চাও ! স্পর্ধা শুধু···

রথের মেলায়

হাত নেই তার, দেবতা।
পা নেই, তবু সে দেবতা।
কেন না পেটটি তার
সত্যি চমৎকার!

সাগ্নিক

অস্থির হয়ো না;
শুধু, প্রস্তুত হও!

এখন, কান আর চোখ
খোলা রেখে
অনেক কিছু দেখে-যাওয়ার সময়।

এ সময়ে
স্থির থাকতে না পারার
মানেই হল, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া।

তোমার কাজ
আগুনকে ভালবেসে উন্মাদ হয়ে যাওয়া নয়—
আগুনকে ব্যবহার করতে শেখা।

অস্থির হয়ো না;
শুধু, প্রস্তুত হও!

কার তামাক কে খায় ?

(আফ্রিকার জনৈক 'পিগ্‌মি' আদিবাসীর বিলাপ)

বিরাট বন, তোফা বাতাস !
তীর-ধনুক তোর হাতের মুঠোয় ; এবার তৈরী হ !

এদিকে, ঐদিকে, এদিকে, আবার ঐদিকে…
একটা ধাড়ী শুয়োর ! কে রে, শুয়োরটাকে মারলো ?
নিকু মারলো।
কিন্তু খায় কে ? হতভাগা নিকু !
শুয়োরটার ছাল ছাড়ালি তুই ; কাটলি কুটলি !
তোর ভোজনের জন্য বরাদ্দ হল শুধু নাড়ি-ভুঁড়ি !

শব্দ কী ! যেন কানে লাগলো তালা !
এ-যে এক বিরাট হাতি ! একেবারে সামনে !
কে মারলো হাতিটাকে ?
নিকু মারলো।
কে পেলো বাহারের দাঁত-দুটো ? হতভাগা নিকু !
সব সময় তুই করবি হাতি শিকার ; তোর জন্য ওরা
রেখে দিয়েছে হাতির লেজ !

তোর বাড়ি নেই, ঘর নেই ; যেন তুই একজন বানর রে নিকু !
—মানুষ নোস !
কিন্তু মৌমাছি তাড়িয়ে মধু জোগাড় করার বেলায় তুই !
কে ঐ মধু খায় ?—যতক্ষণ না পেট ফুলে ফেটে যাওয়ার মত হয় ?
না রে, হতভাগা ! তুই না ! তোর জন্য পড়ে আছে
শুধু কয়েক টুকরো মোম !

ঐ-যে, তোর সামনেই ব'সে, সাদা-চামড়ার ভাল মানুষরা !
কে তাদের ঘুরে-ফিরে নাচ দেখায় ? তুই রে, নিকু ! তুই !
কিন্তু তোর তামাক খেয়ে নিলো কে ? হতভাগা নিকু !

নিকু রে ! চুপ ক'রে ব'সে থাক ! অপেক্ষা কর ! ওরা ফেলে-দেবার আগে
সিগারেটের শেষ টুকরোটা কখন তোর দিকে এগিয়ে দেয় !

[বিদেশী কবিতার অনুবাদ]

কালো মায়ের স্বপ্ন / কালুনগানো

(আমার মা-কে)

কালো মা
তাঁর শিশুকে দোল খাওয়ান
আর তাঁর কালো চুলে ঢাকা
কালো মাথার মধ্যে
তিনি চমৎকার স্বপ্নগুলিকে
আগলে রাখেন।

কালো মা
তাঁর সোনা তাঁর মাণিককে দোল খাওয়ান
আর ভুলে যান
পোড়া মাটি সমস্ত ভুট্টার ক্ষেত শুষে নিয়েছে,
গতকাল গমের শেষ দানাটিও ফুরিয়ে গেছে।
তিনি সেই সব চমৎকার পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন
যেখানে তাঁর ছেলে একদিন পাঠশালায় যাবে
এমন পাঠশালায়
যেখানে মানুষের ছেলেরা পড়াশুনা করে।

কালো মা
তাঁর শিশুকে দোল খাওয়ান
আর ভুলে যান
তাঁর সহোদর ভাইয়েরা শহরের পর শহর, বন্দরের পর বন্দর গ'ড়ে তুলছে
একটির পর একটি ইঁট নিজেদের রক্তে জুড়ে দিয়ে।

তিনি সেই সব চমৎকার পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন
যেখানে তাঁর ছেলে একদিন রাস্তায় ছুটাছুটি করবে
এমন রাস্তায় যেখানে মানুষ চলাফেরা করে।

কালো মা
তাঁর সোনা তাঁর মাণিককে দোল খাওয়ান
আর কান পেতে শোনেন
বাতাসে দূর থেকে কী কথা, কী গান ভেসে আসছে।
তিনি সেই সব চমৎকার পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন
সেই সব চমৎকার পৃথিবীর
যেখানে তাঁর ছেলে একদিন বেঁচে থাকতে পারবে।

মানুষ রে, তুই

মানুষ রে, তুই সমস্ত রাত জেগে
নতুন ক'রে পড়,
জন্মভূমির বর্ণ পরিচয়!

পায়ের নীচে তোর
গভীর হচ্ছে চোরাবালির চেয়ে ভীষণ
ঘুমের শূন্যতা;
তুই
সারাজীবন শিখলি পরের মুখের কথা,
শুধুই কথা!
রাজেশ্বরী জননী তোর তাই উপোসে
রাত্রি কাটায়।

বোঝে না তোর মুখের ভাষা!

আমি কোথায় পাবো তারে ?

কোথায় পাব আমি
কঠিন সত্য চেঁচিয়ে বলার সাহস ?
জন্ম থেকেই আমি মিথ্যার মুখোশ
দেখেছি, তার অসীম স্পর্ধা !
জ্ঞান না হতেই ভূত-তাড়ানোর ওঝা
আমার অবাধ্যতাকে কান ধ'রে
দুই গালে চড় মেরেছে ! আমি
কখনো 'নীল-ডাউন' কখনো 'চেয়ার' হয়ে
জেনেছি যাঁর শরীরে আছে পশুর দন্ত
তিনিই আমার পাঠভবনের আদর্শ ঈশ্বর !

কোথায় পাব আমি
আমার মনুষ্যত্ব, আমার সাহস ?
আমি স্কুলের নষ্ট ছেলে অনেক দেখে, অনেক শিখে
হয়েছি পাড়ার সুবোধ বালক। স্বাধীন মহাদেশের
আমি মজার খেলনা—আমার চাকরি নেই,
ভাষণ শুনি। আমার চাকরি নেই,
পুলিস দেখলে ভয়ে পালাই।

কোথায় পাবো আমি
মুখোশগুলি টুকরো করার সাহস ?

অরুণ বরুণ কিরণমালা

১

ঘর পাথর
পথ পাথর
পাথর কুয়ার জল
পাথর ফুল, ফল…

২

ঘর ছেড়েছে অরুণ
—পাথর
পথ হেঁটেছে বরুণ
—পাথর ;
দেখতে দেখতে আকাশ পাথর, মেঘ পাথর,
পাথর গাছপালা !
পাথর দেশে পাহাড় ভেঙে, আকাশ ভেঙে
চ'লেছে কিরণমালা…

নীলকমল লালকমল

নীলকমল লালকমল
খুঁজছে তাদের সত্যিকারের মা, লুকিয়ে যিনি মানুষ খাবেন না।
এই দেশে নয়, ওই দেশে নয়
কোথায় আছে সত্যিকারের দেশ, সত্যিকারের আকাশ, সত্যিকারের বাতাস
খুঁজছে তারা—আজও জানে না
কোথায় আছে ভোরবেলার অমল আলোর মতো সত্যিকারের মা…

১৫ আষাঢ, ১৩৮৩

পূর্ণ কুম্ভ-মেলায় ভিক্ষুকের গান

একদা মা-কে দিয়েছিলাম দোষ,
'তুমি কেন অর্ধেক ভিখারী।
না-হয় আমরা ঘরে করবো উপোস ;
তাই ব'লে কি যাবে রাজার বাড়ি ?'

'ছেলে, আমার ছেলে !
ঘুঁটে কুড়িয়ে পেট তো ভরে না !
দোষ যদি হয় রাজার বাড়ি গেলে,
ছেলের উপোস দেখবে কি তার মা ?'

একদা মা-কে দিয়েছিলাম দোষ,
ছিলেন তিনি অর্ধেক-ভিখারী।
এখন আমার রাজার সঙ্গে ভাব ;
কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমার আড়ি !

কবি তো অনেক

(জগন্নাথ বিশ্বাসের জন্য, একটি স্বীকারোক্তি)

কবি তো অনেক এই দেশে, সার্থক-জনমদের মহতী সভায়
ছড়ায় বিদুষী বাক্ ;
যখন হাজার শিশু রক্তকর্দমের মতো পড়ে থাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ;
দিগ্বিদিক অন্ধকার হ'য়ে আসে কে-বা পিতা, কে-বা মাতা, উলঙ্গের
কান্না ও গর্জনে !

কবি তো অনেক, বুক জুড়ে সোনার মেডেল ; লেখে চতুর্দশপদী,
চম্পূ কাব্য ; আলো করে বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়া কৃষ্ণনগরের আহ্লাদী
পুতুলদের জলসাঘর ;
তুমি আমি বাইরের দর্শক। রাস্তা হাঁটি
চোখে পড়ে চাপ চাপ রক্ত, আর সমস্ত শরীর বেঁকে যায় দুঃসহ বমনে।

আমরা কবি নই। আমাদের জন্মদিন, হা-ঘরে হা-ভাতেদের এই দেশে
আমাদের সার্থক জনম, তাই বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপের মতো মনে হয়…

দুই পুরুষ

১

তেরশ তিরিশ সন, সতেরোই ভাদ্র
বক্সার জেল থেকে সুরপতি ভদ্র
যে চিঠি লিখেছিলেন :
'শোনো, মণিময় সেন।
ইংরেজ জাতটাই অতীব অভদ্র…'

২

তেরশো আশি-তে ফের মণিময় সেন
চিঠি পান, সুরপতি ভালই আছেন ;
এসেছেন দিল্লীতে
তামার পাত্র নিতে—
ইংরেজ-তাড়ানোতে তিনিও ছিলেন ।

'পুনশ্চ : মণিময় ! একটাই কষ্ট—
ছেলেটা কুপথে গিয়ে একেবারে নষ্ট !
থাকতে ঘরের ভাত
খায় সে জেলের ভাত…'
(চিঠির তারিখ, ইত্যাদি অস্পষ্ট !)

এক বিদূষকের স্বগতোক্তি

'Everything that I laughed at became sad.'—Gogol

হেসে উড়িয়ে দেবো যে, আমার চারদিকে হাসির কী আছে ?
যে দিকে চাই নরক শুধু ! হাত পা ভাঙা মানুষগুলো
জোর ক'রে লোক হাসাবে ব'লে কানে তুলো পিঠে কুলো
যে-যার রক্ত করছে পিছল অদ্ভুত এক মুখোশ-নাচে ।

নাচ যদি হয় ভাঙা হাত-পা আবার ভেঙে টুকরো করা
নাচ যদি হয় রক্তে-ভাসা মুখোশগুলির রঙিন হওয়া ;
সে-কী ভীষণ হাসির ব্যাপার—হাসি কি সেই দমকা হাওয়া,
উড়িয়ে দেবে ওই নাচ-ঘর, ডাকিনীদের মন্ত্রপড়া ।

কালো মানুষের গান

(পল রোবসন-কে মনে রেখে)

তুমি
পৃথিবীর কালো মানুষের গান,
অপমানিতের চোখের জলকে লাবণ্য করো
তোমার প্রেমে

আর প্রতিবাদ করো
অপ্রেমের অশুচি-স্পর্ধার !

তুমি
পৃথিবীর বিষণ্ণ মানুষের·গান···

মাঘ, ১৩৮২

সত্যকাম শ্রীমানের জন্য : কালবেলার কবিতা

শ্রীমান, তুমি ভাল থাকো !
তোমার মনে পাপ
আগুনে হোক শান্ত ! যেন
পিতার অভিশাপ

জন্ম থেকে তোমাকে জলে
ভাসিয়ে না দেয় । তুমি
চারদিকে একলক্ষ সাপের
মধ্যে জন্মভূমি

জেনেছ দুঃখিনী মায়ের
মতই অসহায় !
শ্রীমান, তুমি ধৈর্য ধরো
এমন কালবেলায় ।

মানুষ নাম

'মানুষ' নাম
যখন বুকের ভেতর থেকে
উঠে আসে
তখন দারুণ শীতেও
আমরা আগুন পোহাই
আর আমাদের মরুভূমিগুলি
এক আশ্চর্য নদীর গানে
স্নিগ্ধ হয়।

এখন
সময় যদিও ভয়ঙ্কর
যখন
কোনো পার্থক্যই করা যায় না
কবির সঙ্গে বেশ্যার, একমাথা পাকা চুলের সঙ্গে
কৃষ্ণনগরের আহ্লাদী পুতুলদের
তবু
এখনই
এই নরকেও
'মানুষ' নাম, তার গভীর মন্ত্রের উচ্চারণ
আমাদের নিঃশ্বাসের বাতাসকে
মধুময় করে।

আর
এই কারণেই
দুঃখের কান্নাগুলিকে
সন্তর্পণে বুকের মধ্যে আগলে রেখে
আমাদের সমস্ত রাত জেগে থাকা
দিন নেই রাত নেই
আমাদের বাঁচার জন্য এত লড়াই ;

মৃত্যুর মুখোমুখি,
তার অশ্লীল বিদ্রূপ
তার প্রচণ্ড মারের তোয়াক্কা না রেখে
কবির সমাজে সমস্ত জীবন ব্রাত্য থেকেও
আমাদের এত রক্তপাত…

পৌষ-সংক্রান্তি, ১৩৮৩

রাজা আসে যায়

১

রাজা আসে যায়   রাজা বদলায়
নীল জামা গায়   লাল জামা গায়
এই রাজা আসে   ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের   রং বদলায়…
                    দিন বদলায় না!

গোটা পৃথিবীকে গিলে খেতে চায় সে-ই যে ন্যাংটো ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার লড়াই চলছে, চলবে।
পেটের ভিতর কবে যে আগুন জ্বলেছে এখনো জ্বলবে!

২

রাজা আসে যায় আসে আর যায়
শুধু পোশাকের   রং বদলায়
শুধু মুখোশের   ঢং বদলায়…
          পাগলা মেহের আলি
          দুই হাতে দিয়ে তালি
এই রাস্তায়, ওই রাস্তায়
          এই নাচে, ওই গান গায় :
'সব ঝুট হায়! সব ঝুট হায়! ঝুট হায়! সব ঝুট হায়!'

৩

জননী জন্মভূমি
সব দেখে সব শুনেও অন্ধ তুমি !
সব জেনে সব বুঝেও বধির তুমি !
তোমার ন্যাংটো ছেলেটা
কবে যে হয়েছে মেহের আলি,
কুকুরের ভাত কেড়ে খায়
দেয় কুকুরকে হাততালি···
তুমি বদলাও না ;
সে-ও বদলায় না !

৪

শুধু পোশাকের রং বদলায়
শুধু পোশাকের ঢং বদলায়···

বিষণ্ণ মানুষের গান

(কাজী নজরুল ইসলামের নির্বাক পাথরের মূর্তি স্বপ্নে দেখে)

শস্যের শ্যামলী লক্ষ্মী আর পিপাসার জল সরস্বতী কবিতা আমার ;
সমস্ত জীবন আমি তোমাদের মুখ দেখি, স্বদেশের বিষাদ প্রতিমা
সমস্ত জীবন আমি তোমাদের শুভ্র স্তনে স্পর্শ করি আসমুদ্রহিমাচল কান্নার লবণ

অথবা তুষার সব, ভারতবর্ষের নদী, বিশল্যকরণী বৃক্ষ, তোমার আমার জন্মভূমি।

আমার ঈশ্বর নেই

আমার ঈশ্বর নেই ব'লে
সবাই আমাকে উপহাস
ছুঁড়ে দেয়। অথচ আমি যে

ঈশ্বর বানাই, বারোমাস
তাই তারা কিনে নেয় ঘরে।
নিরীশ্বর মাথার উপর
আমি খুঁজি আকাশের রঙ
শুনি সপ্তর্ষির মৃদুস্বর

কুয়াশায়। স্বর্গীয় বাতাসা
মুখে ক'রে কীর্তনের দল
ঘরে ফেরে। ভক্তেরা ঘুমায়।
তাদের ঈশ্বর অন্তর্জল
পদ্ম হয়ে স্বপ্নের ভিতর
হাওয়া দেন।···নিষিদ্ধ আঁধারে
আমি খুঁজি আমার পাথর
মেঘে, বজ্রে, শূন্যে, তেপান্তরে।
২৮ ভাদ্র, ১৩৮৪

সেই অহঙ্কার আমাদের, সেই স্পর্ধা

অহঙ্কার থাকা ভাল ;
কিন্তু নিজেকে নিয়ে নয়।
স্পর্ধা থাকা ভাল :
কিন্তু দল, এমনকি দেশকে নিয়েও নয়।

সেই অহঙ্কার আমাদের মানায় :
আমি একজন মানুষ, সমস্ত পৃথিবীর নাগরিক আমি।
সেই স্পর্ধা আমাদের ভাল রাখে :
মানুষের চেয়ে নির্মল এই পৃথিবীতে কিছুই নেই,
আমারও অধিকার আছে মনুষ্যত্বে।
অহঙ্কার থাকা ভাল
যে অহঙ্কার আমাদের উদার হতে শেখায়, বিনীত করে, এবং
অন্ধকারে স্থির থাকার শক্তি দেয়।

স্পর্ধা থাকা ভাল
যে স্পর্ধা আমাদের কানে মন্ত্র দেয় : 'মানুষকে ভালবাসো।
মানুষের জন্য বাঁচো !
আর, যদি কখনো প্রয়োজন হয়—মানুষের জন্যই মরে যাও ! তুমি মানুষ !'
সংশোধিত
মার্চ ১৯৭৭

লিখতে হয় লিখবি কবিতা

লিখতে হয় লিখবি কবিতা
কিন্তু মনে রাখিস
জীবন নয় কবিতা এই উলঙ্গের হাড়ের পাহাড়,
নিরন্নের চোখের জলের নদী—
যাদের তোরা দেশ ব'লেছিস, প্রেমিক !

লিখতে হয় লিখবি কবিতা
কিন্তু যদি সত্যিকারের ভালবাসিস জন্মভূমির মানুষ
তাহলে তার জন্য আগে কাপড় বোন, আগুনে সেঁক রুটি।

স্থির চিত্র

(শ্রীগোপাল মৈত্র, সুহৃদ্বরেষু)

সবই তো এক রকম
আমাদের চোর পুলিশ স্কুল কলেজ হাসপাতাল,
এই দেশে মানুষের পা রাখার জায়গা কোথায় ?

এখানে শিশুরা আসে জন্মনিয়ন্ত্রণের হুকুম মেনে :
এখানে বেকার যুবকরা মাইলের পর মাইল
এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা কিউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে

এক প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধার স্পর্ধাকে
তাদের বুকের হাড় আর পিঠের চামড়া খুলে দেয়
যা তাদের বেঁচে থাকার মাশুল।

কিছুই বদলায় না। আমাদের স্বপ্নগুলি
বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের মতো
সমস্ত দিন, সমস্ত রাত যাকেই সামনে পায়
তারই পা জড়িয়ে ভিক্ষা চায়;
যে দৃশ্য আমরা জন্ম থেকে দেখে আসছি

তবু আমরা অপেক্ষা করি; এক মন্ত্রী যায়, অন্য মন্ত্রী আসে
আমরা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।
আমাদের বুকের ভেতর বোবা শব্দগুলি আর একবার মুখর হয়ে ওঠে:
'আল্লা! মেঘ দে! পানি দে!'
আর প্রতিশ্রুতিগুলি কাগজের নৌকার মতো
বর্ষার একহাঁটু জলে ইতস্তত ভেসে যায়।

বন্দী প্রমিথিউস

পশুরা
তার তেজে
দগ্ধ হয়েছে।

তাই তারা
প্রতিশোধ নিয়েছে।

তাদের পাশবিকতা
খুবলে নিয়েছে তার শরীর থেকে
তার রক্ত
তার মাংস।

কিন্তু সে
তার আধ-খাওয়া শরীরের ভিতর
আজও সযত্নে বহন করে
আগুনের পরশমণি,
তার বন্দী জীবনের
মনুষ্যত্ব

তার
প্রতীক্ষা করে,
কয়েদখানার কঠিন শুষ্ক পাথরের ভিতর
একদিন অঙ্কুরিত হবে
তার গান…

একলা জেলে বন্দী তিনি

একলা জেলে বন্দী তিনি
শোনেন, দূরে চিড়িয়াখানায়
বাঘ ডাকছে। আবার কখন
বাঘের ডাককে ছাড়িয়ে যায়

একশো গাধার জয়ধ্বনি
দিন দুপুরে—শোনেন তিনি।
শুনতে শুনতে ভাবেন তিনি
বাঘের তাতে কী আসে যায়?

মানুষের বা কী আসে যায়?

অন্য মহাশ্বেতা

তোমার কলস ভর্তি জল ছিল ; কিন্তু আমি সেই জল স্পর্শও করিনি,
কেননা তোমার মুখে মানবীর লাবণ্য ছিল না।
আমার মহাশ্বেতা দেবী নয়, তার মুখের অমলতা স্পর্ধায় জ্বলে না!
বরং সে করুণায় ম্লান!

তুমি সোনার কলস কাঁখে চলে যাও…
আমি মাটির কলস ছাড়া পিপাসা জানি না।

দিবস-রজনীর কবিতা

ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি
কুয়াশা নাচায় মাঘের ভোরবেলা।

গভীর ঘুমে সূর্য পড়ে ঢাকা।
মেঘেরা যায় তিনপাহাড়ের কান্না ভেঙে
দারুণ শীতে।

তবু হাজার হলুদ ফুল
ব্যথায় নীল আমার দেশের আঁধার ছুঁয়ে
কাঁপায় জাগরণের বিভাবরী…

ভালোবাসার মানুষ

ভালোবাসার মানুষ
শীর্ণ নদীর মতো
নতজানু

কখন আকাশ ভেঙে নামবে
চোখের জল…

বানভাসি

দেখে এলাম সেই মহাদেশ, যার নদীতে
বাঘ ও ছাগল একসাথে জল খায়
এবং মানুষ লঙ্গরখানায় যায়
প্রতি বছর বেঁচে থাকার খাজনা দিতে।

ইতিহাস-স্যার

আমাদের ইতিহাস-স্যার
যা জানেন—
নীল ডাউন
চেয়ার
কানমলা।

এই বিদ্যা নিয়ে
তিনি আমাদের শেখান
সভ্যতা
সংস্কৃতি
ও
রাজনীতি ;
অর্থাৎ—
কানমলা
চেয়ার
নীল ডাউন।

যখন ক্লাশের ঘণ্টা শেষ হয়
তিনি
আমাদের বিকেলটাকে
একঘণ্টা ডিটেন করিয়ে
তাঁর শেষ-কর্তব্য
অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপন করেন।

তখন
লোডশেডিং-এর মতো মুখ ক'রে
আমরা
যে-যার বাড়ি ফিরি।

আর
এইখানেই তো
আমাদের রাজনীতি
সংস্কৃতি
ও
সভ্যতা…

তাপ্পি আর ওভারকোটের গান/বের্টল্ট ব্রেশট

যখনই আমাদের শীতের ওভারকোট ছিঁড়ে ন্যাকড়ার মতো হয়ে যায়
আপনারা ছুটতে ছুটতে আসেন আর বলেন : এভাবে আর চলতে পারে না;
তোমাদের যতভাবে সম্ভব সাহায্য করতেই হবে।
আর অসীম উৎসাহ নিয়ে আপনারা ওপরতলায় ছুটে যান
যখন আমরা, যারা শীতে জমে যাই, অপেক্ষা করতে থাকি।
একসময় আপনারা ফিরে আসেন আর বিজয়ীর মতো
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন, যা যুদ্ধে জিতে এনেছেন—
একটুকরো তালি-দেওয়া কাপড়।
চমৎকার, এটা যে একটা টুকরো কাপড়
সন্দেহ নেই;
কিন্তু আস্ত ওভারকোটটা কোথায়?

যখনই আমরা খিদের জ্বালায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি
আপনারা ছুটতে ছুটতে আসেন আর বলেন : এভাবে চলতে দেওয়া যায় না
তোমাদের যতভাবে সম্ভব সাহায্য করতেই হবে।
আর অসীম উৎসাহ নিয়ে আপনারা বড়-মাথাদের কাছে ছুটে যান

যখন আমরা, যারা উপোসে জ্বলি, অপেক্ষা করতে থাকি।
একসময় আপনারা ফিরে আসেন আর বিজয়ীর গর্বে
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন, যা আমাদের জন্য জিতে এনেছেন—
রুটির একটা ছেঁড়া টুকরো।

চমৎকার, এটা যে একটা টুকরো রুটি
সন্দেহ নেই;
কিন্তু আস্ত রুটিটা কোথায়?

আমাদের যা দরকার তা এক টুকরো তাপ্পির চেয়ে অনেক বেশী,
আস্ত ওভারকোটটাও আমরা চাই;
আমাদের দরকার একফালি রুটির চেয়ে অনেক বেশী,
আমরা চাই আস্ত রুটিটাকেই।
শুধু গতরখাটার কাজ নয়, আরও অনেক কিছু আমাদের চাই—
গোটা কারখানাটাই, কয়লা আর ইস্পাত, সবকিছু আমাদের দরকার:
আমরা চাই আমাদের রাষ্ট্র আমরাই চালাবো।

সুন্দর, এ হলো আমাদের যা
মোটামুটি দরকার;
কিন্তু আপনারা আমাদের জন্য
হাতে ক'রে কী এনেছেন?

মে-দিনের সংবাদ

মে-দিন কি আমাদের মুখের উজ্জ্বলতা?

অথবা অন্ধকার আরও গাঢ় হয়;
হঠাৎ আঙুলে লাগে মুখোশ;

আমাদের চোখের পাতায় আজ কি দিন
কি রাত্রি সব পাথরের মতো ভারি!

নাকি, সংবাদেই সব সুখ?

আঁধার যায় না : জন্মদিনের কবিতা

আঁধার যায় না। এক মন্ত্রী যায়
অন্য মন্ত্রী আসে
কবির সভায়। তারা কবিতা পড়ে না, তবু
তারা কবিতার সারাৎসার
ব্যাখ্যা করে। আঁধার যায় না। শুধু
জন্মদিনে কলকাতার আকাশে, বাতাসে
ভূতুড়ে আলোর মতো ছায়া ফেলে মাননীয়
মন্ত্রীদের মুখের বাহার !

ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে

ঘর ফুটপাথ
আহার বাতাস,
ন্যাংটো ছেলেটা
দেখছে আকাশ।

সেখানে এখন
টেক্কা সাহেব
বিবি ও গোলাম—
রাজ্যের তাস

সবাই ব্যস্ত ;
সবাই করছে
চাঁদ সূর্য ও
তারাদের চাষ ;

সবাই চাইছে
রাজত্ব, আর

সবাই লিখছে
দারুণ গল্প।

সেই শুধু ফুট-
পাথের ন্যাংটো
ছেলে, তাই তা
বুদ্ধি অল্প—

দূর থেকে তাই
দেখছে দৃশ্য,
দেখছে এবং
দিচ্ছে সাবাস!

আবহমান বাংলার কবিতা

'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে?' —ঘুমপাড়ানী ছড়া

বর্গীর চেয়েও
কে ভীষণ
বুলবুলি, ধান খেয়ে যায়
হেমন্তে

চাষীর ঘরে
কুপিও জ্বলে না, শিশু
পাখি দেখে ভয় পায়

সোনার বাংলায়
মুঠি মুঠি সোনা ধুলো হয়, জননীর
মুখে ঘুম-পাড়ানীর গান

মনে হয়
বুক থেকে উঠে আসা
বাংলার শপথ

রক্তে ভাসে!

সংশোধিত

এক অন্ধকার থেকে

এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে
আমাদের কান্নাগুলি ক্লান্ত হেঁটে যায়।
চারদিকে হলুদ পাতা, কুয়াশা, হায়নার ডাক :
'কারা যায়? কেন যায়? কত দূরে? কোথায়? কোথায়!'

পাষাণের চেয়ে ভারী দীর্ঘশ্বাসগুলি ক্রমে
তাদের ঘনিষ্ঠ হয়, অন্ধকারে গলা চেপে ধরে :
'দাস-জীবনের গান জানো যদি, তাই শোনাও—
কোথা যাও? দেখ না কি, সামনে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে!'

ভগ্নজানু, তবু তারা বুক-হেঁটে সামনে চলে
অবেলা ছাড়িয়ে অন্য কালবেলার দিকে—
যেখানে কবিরা পড়ে আনন্দ-ভৈরবী! মুক্তমেলার আলোয়
চোখে পড়ে গুলিবিদ্ধ হাজার হাজার শিশু, রক্তকর্দমের মত, যাদের
বুকের রক্ত কবির রক্তের চেয়ে ফিকে…

একটি অসমাপ্ত কবিতা ২

(নিহত প্রবীর দত্ত-কে মনে রেখে)

মাথার ওপর সূর্যাস্তের অন্ধকার হ'য়ে আসা আকাশ
আর পায়ের নিচে নিহত কিশোরের খুনে লাল মাটি;

কলকাতার কার্জন পার্ক ;

তোর বিশে জুলাই, তোর গান, তোর শপথ
তোর ভিয়েতনাম

মানুষের রক্তের ভিতর, তাকে কেড়ে নিতে পারে
এমন লাঠিয়াল ভূত, এমন মানুষ-খেকো বাঘ
পৃথিবীতে কোথায় আছে ?

আমাদের মাতৃগর্ভগুলি
এই নষ্ট দেশে, চারদিকের নিষেধ
আর কাঁটাতারের ভিতর

তবু প্রতিদিন
রক্তের সমুদ্রে সাঁতার-জানা হাজার শিশুর জন্ম দেয়
যারা মানুষ···

কেন আমাদের শিশুরা

কেন আমাদের শিশুরা ঘুমের মধ্যেও কালোগাড়ি দেখে
'পুলিস ! পুলিস !' বলে চিৎকার ক'রে ওঠে ?
কেন আমাদের কিশোর ছেলেরা ভরদুপুরে রাস্তায় পুলিস দেখলে
ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে অন্য ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে ?
কেন আমাদের জোয়ান ছেলেদের গুলি ক'রে মাথার খুলি আর
জুতো দিয়ে বুকের পাঁজরা থেঁতলে দেওয়া হয় ?
কেন আমাদের যুবতী কন্যাদের সিঁথির সিঁদুর আর চোখের জল
একটিই রক্তের নদী হ'য়ে যায় ?
কেন চোর ডাকাত আর খুনীদের জন্য এই দেশ
আর দেশের জেলখানাগুলি আমাদের পায়ের নিচের একমাত্র শক্ত মাটি ?
কেন ?

সংশোধিত

হিতোপদেশ : অস্থিরমতি বালকদের জন্য

'The fear of the Lord is the beginning of knowledge.'

—The Bible

জ্ঞান তো ভয় থেকেই
যেমন গুরুমশাইয়ের বেত থেকে
আমাদের 'অ আ ক খ' শেখা।

প্রথমে ভয় তারপর ভক্তি
তারপর মথিলিখিত সুসমাচার
আর এই ভাবেই সমস্ত বর্ণপরিচয়টা
একদিন আমাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

বাল্যে উপবাস, যৌবনে কর্মহীনতা
বার্ধক্যে ভিক্ষা :
যত ভয় ততই আমরা জন্মভূমির রক্ত সারা গায়ে মেখে
জ্ঞানের পর জ্ঞান আহরণ করি ; ক্রমেই জ্ঞানের জাহাজ হয়ে যাই
যদি না পোকায়-খাওয়া হৃৎপিণ্ডটার ধুকধুকানি
ইতিমধ্যেই একেবারে থেমে যায়।

এই ভাবেই ঈশ্বর আমাদের ভয়ের পরীক্ষা নেন,
আর ঐ কঠিন পরীক্ষায় পাশ করার পর
যদি তখনো আমাদের বুকে হাড়, পিঠে চামড়া বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে
তিনি তাঁর একনম্বরী পায়ের বুড়ো আঙুলটি আমাদের দিকে এগিয়ে দেন
যার অর্থ : আমাদের জ্ঞান এখন তুঙ্গে—
এখন চোখ বুঁজলেই আমরা সোজা স্বর্গে চ'লে যেতে পারি
এবং অর্জন করতে পারি অনন্তকাল ধ'রে তাঁর পদসেবা করার দুর্লভ
অধিকার।

শিশুদের রক্ষা কর

(লু স্যুন-এর 'A Madman's Diary' সামনে রেখে)

১

শিশুদের রক্ষা করো
যেন তারা মানুষের মাংস না খায়।
সেই সব শিশুরা, যাদের ভাতের সঙ্গে এখনও নরমাংস মিশিয়ে
দেওয়া হয় নি,
যে ভাবে পারো
এই ভয়ঙ্কর পাপ থেকে তাদের বাঁচাও।

২

চার হাজার বছর ধ'রে
এই মহাদেশের
আর এই রকম যে সব দেশ পৃথিবী শাসন করে,
তাদের
সন্তান সন্ততিরা
সবাই মানুষের মাংস খেয়ে বড় হ'য়েছে, কেউ সজ্ঞানে, কেউ নিজের অজান্তে,
একজনও বাদ যায় নি ; কেউ বলতে পারে না
তার থালার প্রতিটি ভাত সাদা।

৩

শুধু, যে-সব শিশু এখনও মায়ের বুকের দুধ খায়
যাদের দাঁত উঠতে আরও কয়েক মাস বাকি,
এখনও সময় আছে, যদি তোমরা শপথ নাও—
তোমরা, যারা এই পৃথিবীতে থেকেও জ্ঞান-পাপী নও,
মানুষের মাংসের গন্ধে যাদের পেট থেকে ভাত উঠে আসে,
খাওয়া মানেই যাদের বমি করা—
যদি তোমরা সংঘবদ্ধ হও,
তোমরাই পারো, একমাত্র তোমরাই পারো
শিশুদের বাঁচাতে।

৪

তোমাদের যা সর্বনাশ হওয়ার
তা হয়েছে ;
এখনও সময় আছে
যে সব শিশুরা মায়ের বুকের দুধ ছাড়া
আর কিছুই স্পর্শ করে নি
তাদের জন্য একটি সহজ পৃথিবী সৃষ্টি করার ;
চার হাজার বছরের পুরানো পৃথিবীটাকে
নষ্ট আবর্জনার মতো
যে-দিকে দু'চোখ যায়, ছুঁড়ে দিয়ে ।

বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা

সেই মেয়েটি
বাজিয়েছিল তালপাতার এক বাঁশি,
রথের মেলায় এক পয়সায় কেনা—
রবি ঠাকুর দেখেছিলেন এক-মুখ তার হাসি ;
দেখেছিলেন, দেখে তিনিও শিশুর মতো হয়েছিলেন ।

দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে
হঠাৎ চোখে পড়লো কবির, বিষণ্ণ এক ছেলে
রথের মেলায় একা ;
একটি রাঙা লাঠি কিনতো, একটি পয়সা পেলে—
কোথায় পাবে সেই পয়সা ? যার নেই তার কিছুই যে নেই
দেখতে দেখতে কবির মাথার চুলগুলি সব সাদা

দৃশ্য শুধু রথের মেলায় ? দেশ জুড়ে এই হাসিকান্নার তুফান
এই তুফানে কবি দেবেন পাড়ি ;

কিন্তু কোথায় ? যার আছে তার সবই আছে, যার নেই তার
বুকের মধ্যে শুধুই কান্না—
বৃষ্টিতে যায় রথের মেলা ভেসে !

রাজধানীর পিঁপড়ে

'পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে…'

নাচছে ওরা 'তাধিন্ তাধিন্ !
আমরা স্বাধীন…স্বাধীন…স্বাধীন !'
নাচছে ওরা—নাচতে দিন ।

পিঁপড়ের পাখা গজালে পিঁপড়ে
উড়তেই চায় ; উড়তে উড়তে
ঘুরে ফিরে তারা নাচ দেখায়—
উড়তে দিন ।

'ধিন্‌তা তাধিন্, ধিন্‌তা তাধিন্ !
দেশ স্বাধীন…তুই স্বাধীন…আমি স্বাধীন !'—
এর পিঠে ছুরি মেরে, ওর কাঁধে চ'ড়ে স্বাধীন !…
স্বাধীন…স্বাধীন…
পিঁপড়ের পাখা গজিয়েছে যদি, উড়তে দিন, নাচতে দিন ।

উড়ুক পিঁপড়ে, নাচুক পিঁপড়ে ; উড়তে উড়তে
নাচতে নাচতে মরুক পিঁপড়ে—

মরতে দিন ।

চলচ্চিত্র

টুপি মাথায় মানুষ

বুড়ো আঙুলে আকাশ মাপছে
মানুষটা
ব্যাঙের ছাতার মস্ত টুপি মাথায় দিয়ে,

বামনের দেশে।

চোরের মা

চুরির ধন আগলে রাখেন মা :
ছেলে
আজ আছে মন্ত্রী, কাল নেই।

সময়, স্বদেশ, রাজনীতি

মনে হয়
কোথাও এই অমানুষিকতার
শেষ আছে।

ভাবতে ভাল লাগে।

কালকেতু-ফুল্লরার গল্প

(মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' মনে রেখে)

ফুরায় না
ফুল্লরার বারমাস্যা
আর
শূন্য হাতে কালকেতুর
ফিরে আসা

ঘরে
মুখোমুখি
দারুণ উপবাসে ;

ফুরায় না
ছুটি অসহায় মানুষের
সারাদিন
ক্ষুধায় জ্বলতে থাকা

সারা রাত…

তবু
তারা স্বপ্ন দেখে
মাঠ-ভর্তি ধানের
আর
বুক-ভর্তি ভালবাসার
আর
স্বপ্ন দেখতে দেখতে
কালকেতু রাজা হয়, ফুল্লরার মুখে
আবির লাগে।

ভয় দেখানোর গল্প

ছোট্ট মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে বলে, 'মা,
তুমি ভয় পেওনা!'

'মা মণি, তুই চুপ কর। বাইরে
দরজা ছিঁড়ছে বাঘ।'

'আমার বাবা বাঘ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে
আমার দাদা বাঘ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে।'

'মা মণি, তুই চুপ কর। বাইরে
দেয়াল খুঁড়ছে সাপ।'

'আমার বাবা সাপ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে
আমার দাদা সাপ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে।'

'চুপ কর! চুপ কর! বাইরে পুলিস!'

(হাতের লাঠি হাতে, বাবা পাথর!
হাতের লাঠি হাতে, দাদা পাথর!)

'মা মণি, তুই চুপ কর! চুপ কর!'—

বলতে বলতে মা
দেখেন মেয়ে দারুণ ভয়ে পাথর, চোখে পলক পড়ে না!

ঘরে বাইরে কোথাও একটু বাতাস নড়ে না।

আর এক আরম্ভের জন্য

১

বুঝতে পারছি
আমার ডান কাঁধ থেকে
হাতের পাঁচটা আঙুল পর্যন্ত
কিছু একটা হতে চলেছে।

বোধ হয়
এরই নাম ভয়!

তা ছাড়া
বয়েসও তো ক্রমেই বাড়ছে
চুল পাকছে
একটার পর একটা দাঁত খসে পড়ছে,

চোখের মধ্যে মাঝে মধ্যেই মনে হয়
কেমন যেন একটা অন্ধকার !
মাঝে মধ্যেই
দিনদুপুরে আমি ভূত দেখি,
ভূতের হাসি শুনতে পাই ;

কিন্তু কাছে গেলেই
টের পাই, কোথাও কেউ নেই
কিছু নেই,
শুধু বাতাস…

বোধ হয়
এখন থেকে আমি নিজের জন্য
একটি কৈফিয়ত তৈরী করছি,
যাতে আমার ভয়কে
দেখায় অনেকটা পাথরের মতো
আর আমার ভাঙা কলমটাকে মনে হয়
সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

২
আমার ডান হাতে
সবসুদ্ধ পাঁচটা আঙুল ;
একটা কবিতা লিখতে
এতগুলো আঙুলের দরকার হয় না।

কিন্তু কলমটা আস্ত থাকা চাই।

নইলে
আমি যদি একটি প্রেমের কবিতা লিখতে চাই,
সেই কবিতাটি দশ পা হাঁটতে গিয়ে
হয়তো তিনবার আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে !

আর তখনই
আমার কাঁধের ব্যথাটা
আমার পাঁচটা আঙুলকে
চোখ লাল ক'রে হুকুম করবে :
'এবার থামো !—
তোমাদের কি কবিতা না লিখলেই নয় ?
কে পোছে এই সব কবিতাকে ?
এখন কি কবিতা লেখার সময় ?'

বোধ হয়
এরই নাম ভয়।

কিন্তু তবু
আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি
একটি কবিতা লিখতে—
আমি এখনই থামতে চাই না।

৩

একটি কবিতা লিখতে লিখতে
একটি ভয়ের কবিতা লিখতে লিখতে
আমি এখন
প্রাণপণে সেই বাতাসটাকেই
আবার খুঁজছি।

হোক বাতাস,
তবু আমার চারপাশের গভীর শূন্যতাকে
সে-তো পারে, সে-ই পারে
একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠতে :
'এসো সাঙাত ! লড়ে যাও !—
বিনা যুদ্ধে তোমাকে আমি সূচ্যগ্র মেদিনীটুকুও
ছেড়ে দেবো না।'

আর
একটা তেপান্তরের মতো ঘরের মধ্যে
নির্জন, একাকী আমি আমার ভাঙা কলমটাকে
তিন আঙুলের ভেতর শক্ত ক'রে ধ'রে
তখন যে-কবিতা লিখবো
তা নিশ্চয় কোনো কুঁজো হয়ে আসা কাঁধের
ভৌতিক হুকুম পালন করবে না।

আমার দু'চোখে ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার
তা আসুক,
আমি তো এখন শ্মশানের দিকেই
এক-পা বাড়িয়ে আছি।
তা'হলে আর কাকে ভয়?
কিসের ভয়?

বরং আমি আমার পুরোনো কলমটাকে
এবার চিরদিনের জন্য বিশ্রাম দিয়ে
একটি নতুন লেখার-কলম কিনে আনবো,
তাকে দেখতে লাগবে একটি নবজাতক শিশুর মতো—
যার হাসি আর যার কান্নায় কোনো পাপের স্পর্শ লাগে নি;
তবু প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিদিন যে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে
এগিয়ে যাবে পাপের দিকে, নরকের দিকে
মিশে যাবে মানুষখেকো মানুষদের মধ্যে—

কিন্তু তার স্বপ্ন থেকে যাবে…
একটি ছোটখাটো মানুষের বুকের মধ্যে, অল্প একটু জায়গা জুড়ে,
আর তার পৃথিবীটা ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় হতে থাকবে।
সেই নতুন পৃথিবীর জন্য
শুধু তার জন্যই
আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই;

কেননা, আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা
আমাকে হাজারবার কান ধরে ওঠ-বোস করালেও
একই সঙ্গে আমাকে এই অভয় মন্ত্র দিয়েছে,
ভয় দেখানোর মাস্টারমশাইরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য নয় ;
ভূত, রাক্ষস, মানুষ-খেকো, এমনকি সাক্ষাৎ মৃত্যুও নয়;
আসল সত্য রয়েছে আমার মায়ের দেওয়া
ছোটবেলার স্বপ্নের মধ্যে
যা আমার বুকের ভেতর থেকে কেউ কোনোদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

আমি আর-একবার সেই আশ্চর্য স্বপ্ন
যা আমার হারিয়ে যাওয়া কবিতা
যা আমার এবং যে-কোনো মানুষের একটিই বেঁচে থাকার পৃথিবী—
তাকে খুঁজে বের করবো।
সে জন্য আমাকে যত মূল্যই দিতে হোক্।

জানুয়ারী, ১৯৮০

একটুকরো লাল কাপড়

১

লাল টুকটুকে একটুকরো কাপড়
তাকে নিয়ে এত কাণ্ড !

রাশিয়ায় চীনে কিউবায় ভিয়েতনামে
মানুষগুলি ঐ কাপড়টাকে নিশান বানিয়ে
গান গাইতে গাইতে, গান গাইতে গাইতে
যেন সবাই পাগল ! যেন সবাই রাজা !

মাঝে মধ্যেই সময় তাকে নিয়ে
আশ্চর্য রূপকথার গল্প বানায়।
সময় তখন যেসব কবিতা বলে
তা শুনতে শুনতে আমাদের বুকের ভেতর
রক্তের নাচন লাগে।

তখন রাস্তা দিয়ে একজন মানুষকে হেঁটে যেতে দেখলে
আমরা তাকে জড়িয়ে ধরি। তার চাঁদ-কপালে
তখন যেন আলোর বান ডাকে!

মাঝে মধ্যেই সময়
আমাদের গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে।
তখন আমাদের পৃথিবী
সত্যিকারের মানুষের পৃথিবীর মতো মনে হয়।
আমরা সেই পৃথিবীর পায়ের নিচের মাটিকে
চুমু খাই! তার ধুলো
শিশুর হাসির মতো লাগে, তার বাতাস
সেই হাসিকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।
তখন পাখি জাগে, ফুল জাগে, মানুষ জাগে…

২

লাল টুকটুকে এক টুকরো কাপড়
সময় তাকে রাজা বানায়।

আবার, সময় যখন দুঃসময়
সেই কালবেলায়
লাল নিশানকে নিয়ে কী খেলা,
কী সর্বনাশের ভয়ঙ্কর খেলাই
তোমরা দেখাও! তোমরাই! যারা একদিন
আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছিলে, আমাদের পায়ের নিচে মাটি
আর মাথার ওপর আকাশ দেখিয়েছিলে!

এখন একটা পাখিকে দেখে, যদি আমরা বলি : পাখি,
একটা ফুলকে দেখে যদি বলি : ফুল,
তোমাদের দু'কানে আগুনের হল্কা লাগে!
একটা লাল নিশানকে বলতে
এখন তোমরা বোঝো
তোমাদের হাতের লাল নিশান!

সেই লাল যদি আমার দেশের ছোট্ট একটি শিশুর রক্তে
আরও গভীর লাল হয়,
তোমাদের কিন্তু আসে-যায় না।

মাঝে মধ্যেই সময়
আমাদের দিনদুপুরে ঘুম পাড়াতে চায়।
তখন আমাদের চোখের পাতায় কাঁটা লাগে :
হাত দুটো শিকল আর পা পাথরের মতো ভারী হয়ে যায়
তখন আমাদের চোখে ঘুম, কপালে ঘুম
হাতের আঙুলে ঘুম, পায়ের পাতায় ঘুম…
ঘুম !… ঘুম।… ঘুম !…

৩

কে জাগে ?—নীলকমল জাগে।
কে জাগে ?—লালকমল জাগে।
'দুই ভাই নীলকমল লালকমল
তোরা যে মাটিতেই পা রাখিস
আজ সেখানেই রক্তনদী !
যে আকাশেই তোরা হাত বাড়াস
সেখানেই হাড়ের পাহাড়।'
'বেলা আমাদের অবেলা, আমরা পার হয়ে যাবো !
বেলা আমাদের কালবেলা, আমরা জেগে থাকবো।'…
লাল টুকটুকে একটুকরো কাপড়,
তুমিও জেগে থাকো ! যখন রাত গড়িয়ে প্রভাত
আর ভোর গড়িয়ে দুপুর
তুমি জেগে থাকো ! কিন্তু সময়
এখন ডাকিনীর মন্ত্র পড়ছে ; সে ক্রমেই
ভীষণ থেকে আরও ভীষণ হচ্ছে !
তুমি যেভাবেই পারো, জেগে থাকো !